আত্মকথা

চৌধুরী-বংশ



শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আগড়ডাঙ্গা-চৌধুরীবংশ



শ্রীকালীপদ চৌধুরী প্রণীত।



সন ১৩২৯

 [মূল্য এক টাকা মাত্র।

আমার পিতামহী পরমারাধ্যা

৺স্বর্ণময়ী দেবীর

পবিত্র নামে

গভীরতম ভক্তি

ও

শ্রদ্ধার সহিত

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশের বৃত্তান্ত।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কোন্ গোত্র ?	১। ভরদ্বাজ গোত্র।
২। কোন্ গাঁই ?	২। ডিংসাঁই।
৩। কার সন্তান ?	৩। সত্তর সন্তান।
৪। সতরা কয়জন অর্থাৎ কয় সহোদর ?	৪। চারিজন অর্থাৎ চারি সহোদর।
৫। চারিজনের নাম কি ?	৫। (১) সত, (২) জন, (৩) দিব্য, (৪) সিংহ।
৬। কোন্ বেদ ?	৬। সাম বেদ।
৭। সামবেদের কোন্ শাখা ?	৭। কৌথুমী শাখা।

শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ব্রাহ্মণ ইতিহাস (২য় সংস্করণ) ১৮৮পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভূমিকা।

বর্ত্তমান যুগে পাঠক-পাঠিকার নিকট ইতিহাস পাঠের উপকারিতা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে, যাহাদের নিমিত্ত আমি "আগড়ডাঙ্গা-চৌধুরীবংশ" প্রণয়ন করিলাম, তাহাদিগের নিকট ইতিহাস পাঠের সার্থকতা বিবৃত করিলে যথেষ্ট সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

ইতিহাস পাঠে অভিজ্ঞতা জন্মে এবং জাতীয় একতা ও স্বাধীনতার ভাব প্রবল হয়। কি কারণে কোন জাতি বা ব্যক্তি উন্নতি-লাভ করিতে পারে এবং কি কারণে তাহাদের অধঃপতন ঘটে, ইতিহাস তাহা আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করে। পরিশ্রমের সুফল, আলস্যের কুফল, ধর্ম্মের অমৃতময় পরিণাম এবং পাপের বিষময় প্রতিফল ইত্যাদি বিষয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসই আমাদিগকে প্রদর্শন করে।

ইতিহাস জলদ-গম্ভীর-স্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, পার্থিব বস্তুর নশ্বরতা অনিবার্য্য। রাজ্য, ধন-সম্পত্তি, জীবন যৌবন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, সমুদ্র-পর্ব্বতপ্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গম, যাবতীয় পদার্থ একদিন কালের করাল কবলে নিপতিত হইবে। সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, পিতামাতা তাহার চন্দ্রানন দেখিয়া এরূপ আনন্দ-বিমোহিত হন যে, তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না যে, শিশুটীর একদিন ভবলীলা সাঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু কঠোর কালের অভিধানে "দয়া"নামক কোন শব্দই নাই। নিয়তির বিধানে যদি শিশুর অকাল মৃত্যু থাকে, তবে পিতামাতা সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুকে ইহধামে রাখিতে সমর্থ হইবেন না,—করাল কাল তাহাকে গ্রাস করিবেই করিবে। সেইরূপ রাজ্য-সম্পদ মানুষকে এরূপ

মুগ্ধ করিয়া রাখে যে, তাহাদের হস্তান্তর গতি কেহ কখন স্বপ্নেও চিন্তা করেন না। কিন্তু রাজ্য এবং ধন সম্পত্তির একটী অনির্দ্দিষ্ট ভোগ-কাল আছে। তাহা পূর্ণ হইবার সময় একটী অচিন্তিত ধ্বংস-হেতু স্বতঃই উপস্থিত হয়। তখন সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও রাজ্য কিম্বা ধন-সম্পত্তি কেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হন না,—উহা অন্য হস্তে গমন করে। সূর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজ্য, চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের রাজ্য, রোম-রাজ্য, বৌদ্ধ-রাজ্য, অশোকের রাজ্য, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, বল্লালসেনের রাজ্য, মোগল-সাম্রাজ্য—সমস্তই এখন পরহস্তগত। অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদ, হস্তিনার রাজ-প্রাসাদ, রোমের রাজ-প্রাসাদ, পাটলিপুত্রের রাজ-প্রাসাদ, নবদ্বীপের রাজ-প্রাসাদ, গৌড়ের রাজ-প্রাসাদ সমস্তই এখন সর্ব্ব-বিধ্বংসী কালের কঠোর নির্য্যাতনে অরণ্যে বা ধূলি-কণায় পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম-পুস্তক-সমূহ অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায় যে, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে। আরব, পারস্য, গ্রীসপ্রভৃতি রাজ্যের বাবিলন, স্পার্টা, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত, সুবর্ণগ্রাম, তক্ষশিলা এবং কপিলবাস্তুপ্রভৃতি প্রাচীন নগরের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পার্থিব উন্নতির উদয়াস্ত অবশ্যম্ভাবী।

ইতিহাস শুধু যে আমাদিগকে নিরাশার কাহিনীই শুনায় তাহা নহে, সে মুমুক্ষু জাতির কর্ণে আশার রাগিণীও ধ্বনিত করে। ইতিহাস পাঠেই আমরা জানিতে পারি যে, উন্নতির ন্যায় অবনতিও চিরস্থায়ী নহে। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুদেশ পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, অনেক দেশের প্রজা রাজার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেশকে প্রজা-তন্ত্র কিম্বা সাধারণ-তন্ত্র-শাসন

প্রণালীর অধীনে আনয়ন করিয়াছে। আধুনিক উন্নত জাতিসমূহের পূর্ব্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে যেমন জানিতে পারা যায় যে, তাহারা এক সময়ে অতি নগণ্য জাতি ছিল, পরে অদম্য উদ্যম ও অধ্যবসায়-বলে জাতীয় উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে; সেইরূপ প্রত্যেক ধনশালী পরিবারের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের কোন পূর্ব্ব পুরুষ দরিদ্রাবস্থা হইতে কোন কারণবশতঃ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠে যেমন আমরা জানিতে পারি যে, অনেক প্রাচীন উন্নত নগর কালবশে অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ ইতিহাস আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, অনেক অরণ্য এবং ক্ষুদ্র পল্লীও উন্নতিশীল সুন্দর নগরে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন নিরাশার দ্যোতক নহে, তাহা আশার পরিপোষকও বটে।

আবার, ধনমদমত্ত অত্যাচারিগণের ধনোপার্জ্জনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাহাদের অধিকাংশেরই ধন-সঞ্চয় অধর্ম্মমূলক। অত্যাচারী স্বয়ং কিম্বা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ রক্তপাত করিয়া, প্রভুকে ঠকাইয়া, উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, প্রভুর নিষিদ্ধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, কোন বিধবা কিম্বা কোন বারবনিতাকে প্রণয়-পাশে আবদ্ধপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া, প্রতারণাময় নির্ম্মম কুসীদ-ব্যবসায়ে কত ধার্ম্মিক পরিবারের যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া, কিম্বা অন্য কোন অসদুপায়ে ধনসঞ্চয় করিয়া বড়লোক বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এরূপ বড়লোকগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বয়ং কিম্বা তাহার কোন পর-পুরুষ পাপভয়ে ভীত হইয়া দুই একটী পুণ্যকর্ম্মও করিয়া থাকেন।

ইতিহাস পাঠ করিয়াই মনীষিগণ অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সময়নিষ্ঠা বা সময়ানুবর্ত্তিতা, পরিশ্রম, সাহস, মিতব্যয়িতা, সাধুতা, স্বাবলম্বন, দেশভ্রমণ, নিঃস্বার্থ পরোপকার এবং বাণিজ্যপ্রভৃতির

উপকারিতা ও পক্ষান্তরে আলস্য, পরশ্রীকাতরতা, অত্যাচার, অবিচার, পরনিন্দা, পরধনহরণ, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার, পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ-প্রভৃতির অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে—History repeats itself অর্থাৎ পৃথিবীতে একই প্রকার ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে। ইহা অতীব সত্য। অদ্য যে অবস্থায় এবং যে কারণে কোন রাজ্যের বা কোন জাতির, কোন দেশের বা কোন বংশের, কোন নগরের বা কোন পরিবারের, কোন গ্রামের বা কোন ব্যক্তির উন্নতি কিম্বা অবনতি ঘটিল, সুদূর ভবিষ্যতে আবার প্রায় তদ্রূপ অবস্থায় এবং তদ্রূপ কারণে অন্য কোন রাজ্যের বা জাতির, অন্য কোন দেশের বা বংশের, অন্য কোন নগরের বা পরিবারের, অন্য কোন গ্রামের বা ব্যক্তির উন্নতি কিম্বা অবনতি ঘটিবে। এই নিমিত্তই ইতিহাসানুরাগী পণ্ডিতগণ দূরদর্শী হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই বিফল হয় না। এই নিমিত্তই ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ত্রিকালজ্ঞ এবং এই কারণেই তাঁহারা স্বাধীনদেশে চিরকাল অসীম সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন।

প্রাচীন ধনশালী বংশসমূহের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অর্থোপার্জ্জন সাধারণতঃ গলদ্ঘর্ম্ম পরিশ্রমে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রমে হইয়া থাকে। অর্থ উপার্জ্জন করা অপেক্ষা সঞ্চয় করা কঠিন। অর্থ সঞ্চয় করিতে হইলে প্রলোভন ও লোকনিন্দার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। অর্থোপার্জ্জনকারীর পরবর্ত্তী বংশধরগণ দায়াদসূত্রে পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত বিত্তের অধিকারী হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা যে গুণে বিভবশালী হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃ অলস ও বিলাসী হইয়া থাকেন। সেই সময় বংশে ঋণ নিঃশব্দচরণে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে; সেই সময় হইতেই বংশে নানা বিপদ সংঘটনের

সূত্রপাত হয়; তৎকাল হইতেই অল্প মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয়ের আরম্ভ হয়; পরিশেষে সর্ব্বশান্তিহরা দারুণ দারিদ্র্য আসিয়া বংশে প্রবেশ করে। তখন যদি বুভুক্ষাপীড়িত বংশধরগণ পূর্ব্ব পুরুষের অভিমান ত্যাগ করিয়া অনলস, ক্ষিপ্রকর্ম্মা ও সাহসী হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত যত্নবান্ হন, তবেই স্ব স্ব বংশকে দারিদ্র্যের করাল ছায়া হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হন, নতুবা দুর্গতির সীমা থাকে না।

স্বাধীন দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং মৃগয়া-কাহিনী পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা দৃষ্ট হয়। গ্রীস এবং চীনপ্রভৃতি দেশের প্রাচীন পর্য্যাটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তনের হেতু অনুসন্ধান করিলে আমরা যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

ভারতবর্ষেও স্বাধীনতার সময়ে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রথা ছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ এবং কাশ্মীর রাজতরঙ্গিনী উল্লেখযোগ্য। বৈদেশিকগণ বহুবার ভারতাক্রমণ করিয়া সবিগ্রহ দেবমন্দির ও গ্রন্থসমূহ নষ্ট করিয়াছিল। তৎকালের অনেক ইতিহাস লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যের সময় লোকে পার্থিব উন্নতি, অবনতি, জয়, পরাজয় অসার বলিয়া মনে করিত; কেবল নির্ব্বাণ-মুক্তিরই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। সেই সময় হইতে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রথা প্রায় লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তথাচ গ্রহবিপ্র ও ঘটকগণ প্রধান প্রধান বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে লোকের ইতিহাসানুরাগ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রত্যেক দেশের সাধারণ পাঠাগার ঐতিহাসিক পুস্তকে পরিপূর্ণ। দিন

দিন প্রত্নতত্ত্বসমূহ আবিষ্কৃত ও লিপিবদ্ধ হইতেছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট স্বনামধন্য লর্ড কার্জ্জন সাহেবের প্রবর্ত্তিত"প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ-সংরক্ষণ আইনের" (Ancient Monument Preservation Act) সাহায্যে প্রতিদিন কত প্রাচীন সেনানিবাস, দেবমন্দির, কীর্ত্তিস্তম্ভ, অট্টালিকা, উপাসনাগৃহ, সমাধিস্তম্ভপ্রভৃতি আবিষ্কৃত ও রক্ষিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক্ষণে প্রতিদিন হস্তলিখিত প্রাচীন জীবনচরিত, বংশের ইতিবৃত্ত, বংশাবলী, ভ্রমণবৃত্তান্তপ্রভৃতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইতিহাস পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে এক্ষণে আর কেহ সন্দেহ পোষণ করেন না।

আগড়ভাঙ্গা-চৌধুরীবংশের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধেক সম্পত্তি দৌহিত্রগত হওয়া এবং ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী, তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী ও রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীপ্রভৃতি ব্যক্তির আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা এবং ঋণগ্রহণাসক্তি, চৌধুরীবংশের অধঃপতনের মূল কারণ।

আগড়ভাঙ্গার চৌধুরীবংশের প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটী বংশ আছে। এই দুইটী বংশ পরশ্রীকাতরতার অবতারস্বরূপ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে পরশ্রীকাতরতার বিষময় পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। পরেশনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি দৌহিত্রগত হইলে তাঁহার জামাতা বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শ দিয়া এবং উত্তেজিত করিয়া ঐ দুই বংশীয়গণ চৌধুরী-বংশধরগণের অসীম অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল। ইহারা বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তেজিত করিয়া চৌধুরী-বংশধরগণের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করাইয়া বেলা তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত চৌধুরীদের দেবসেবা, গোসেবা এবং বালক-বৃদ্ধের আহার পর্য্যন্ত বন্ধ করাইয়াছিল। বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শ দিয়া পরেশনাথ

চৌধুরীর বাটীস্থ একটী ফলবান্ বৃক্ষ কর্ত্তন করাইয়াছিল। ঐ বৃক্ষের ফল চৌধুরীর বংশীয়গণের শালগ্রাম-সেবায় প্রদত্ত হইত। পুষ্করিণীতে চৌধুরীবংশীয়গণ স্বব্যয়ে মৎস্য উৎপন্ন করিতেন, কিন্তু তাহারা ঐ মৎস্য বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা অপরকে প্রদান করাইত। চৌধুরীদের ঠাকুর-বাটীতে একটী বিল্ববৃক্ষ ছিল। ঐ বৃক্ষের ফল চৌধুরী-বংশীয়গণ তাঁহাদের শালগ্রাম-সেবায় ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাহারা পরামর্শ দিয়া বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা উক্ত বৃক্ষের ফল অপরকে প্রদান করাইত।

চৌধুরীদের কোন অমঙ্গল হইলে তাহারা আনন্দে অধীর হইত এবং মঙ্গল হইলে বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অনুভব করিত। চৌধুরীদের কোন অমঙ্গল হইলে তাহারা সহানুভূতি-প্রকাশচ্ছলে অমঙ্গলসূচক ঘটনাটী পুনঃ পুনঃ চৌধুরী-বংশধরগণের এবং গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করিত। চৌধুরীদের কোন মঙ্গল হইলে, তাহারা এরূপ দুঃখিত হইত যে, মঙ্গলসূচক ঘটনাটী কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না, বরং গোপন করিবার চেষ্টা করিত। চৌধুরীদের সম্পত্তি নষ্ট হইলে তাহা অসংখ্য বার চৌধুরী-বংশীয়গণের ও গ্রামস্থ ব্যক্তিদের নিকট প্রকাশ করিত, কিন্তু চৌধুরীবংশে কেহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কিম্বা কোন রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে, সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সংবাদ মিথ্যা বলিয়া বুঝাইয়া দিত এবং ঈর্ষানলে দগ্ধ হইত।

ঐ দুইটী বংশের মধ্যে একটী বংশের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং কতবার যে অস্থাবর সম্পত্তি উত্তমর্ণগণ ক্রোক করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্য বংশটীর বহু সম্পত্তি চৌধুরীদের সম্পত্তির ন্যায় দৌহিত্রগত হইয়াছে। আশা করি, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এই দুইটী বংশের দৃষ্টান্ত হইতে

পরশ্রীকাতরতার বিষময় পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে এবং এরূপ পাপের কক্ষ হইতে দূরে থাকিতে যত্নবান্ হইবে।

আমার খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর পরলোক গমনের পর আমাদের বাটীস্থ প্রাচীন কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, উহাদের সাহায্যে আগড়ডাঙ্গা-চৌধুরীবংশের একটী ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করিতে পারা যাইবে এবং সেই দিন হইতেই আগড়ডাঙ্গা চৌধুরী-বংশের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা হইল। বাল্যকালে আগড়ডাঙ্গার প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশ সম্বন্ধে অনেক গল্প শ্রবণ করিয়াছিলাম। ঐ সমস্ত গল্পের মধ্যে অনেক বিষয় তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন এবং অনেক বিষয় তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমার পিতা, খুল্লতাত এবং পিতামহ-সম্বন্ধীয় অনেক ঘটনা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম এবং অনেক বিষয় তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম। এই সমস্ত উপাদানের সাহায্যে আমি আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশের বহুসংখ্যক প্রাচীন কাগজ দুইটী কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তন্নিমিত্ত এই ইতিবৃত্তে ইহা অপেক্ষা আর অধিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াছি। একটী কারণ বর্গীর হাঙ্গামা এবং অন্য কারণ দেশ-ধ্বংসী কলেরারোগে তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী, রাধিকা-প্রসাদ চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী এবং পুত্রদ্বয়ের যুগপৎ পরলোক গমন। বর্গীগণ বাক্স, পেটরা অনুসন্ধান করিয়া অর্থ না পাইয়া তন্মধ্যস্থ কাগজ পত্রাদি ক্রোধান্ধ হইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। দারা-পুত্রপ্রভৃতির শোকে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর বিষয়ে অনাস্থা জন্মিয়াছিল এবং আমি জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদাই নানা

স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম; তৎকালে বল্মীক, কীট এবং মূষিক প্রভৃতিতে প্রাচীন কাগজের সাতটী পেট্‌রা মৃত্তিকা-স্তূপে পরিণত করিয়াছিল।

এই ইতিবৃত্তের মধ্যে আমার বিষয় যে স্থলে লিখিত হইয়াছে, তথায় প্রায়ই "আমি" কথার পরিবর্ত্তে "কালীপদ চৌধুরী" এবং "আমার" পরিবর্ত্তে "কালীপদ চৌধুরীর" ব্যবহার করিয়াছি।

শ্রাদ্ধে প্রয়োজনীয় বলিয়া কতিপয় পরলোকগত ব্যক্তির মৃত্যুর তিথি-বারাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় ভাগে আগড়ডাঙ্গা গ্রামের কয়েকটী লোপপ্রাপ্ত এবং জীবিত বংশের ইতিবৃত্ত এবং তৃতীয় ভাগে আগড়ডাঙ্গার চৌধুরী পরিবারের কতিপয় ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব-বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইল।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতা থানায় দুর্ব্বৃত্ত জাতিসমূহের (Criminal Tribes) গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ-বিষয়ক বিশেষ কার্য্যে (Special duty) নিযুক্ত থাকার সময় সন ১৩২৬ সালের ২৪শে ভাদ্র বুধবার, ইংরাজি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর এই পুস্তকটী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং উক্ত জেলার নারায়ণগড় থানায় উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময় সন ১৩২৯ সালের ৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার ইংরাজি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট তারিখে উহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বিলম্বের মুখ্য কারণ—শ্রমসাধ্য রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সময়াভাব এবং গৌণ কারণ—পুস্তকের উপাদান সংগ্রহার্থ কোন ব্যক্তিকে পত্র লিখিলে বহু বিলম্বে উত্তর আসিত এবং অনেক স্থল হইতে উত্তর আসিত না।

সংশোধনের সময়াভাববশতঃ পুস্তকটীতে পুনরুল্লেখ ও বর্ণাশুদ্ধি থাকিয়া গেল। আশা করি, ভবিষ্যতে চৌধুরীবংশের কেহ দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার সময় পুস্তকটী সংশোধন করিয়া লইবে।

বর্ত্তমান ইতিবৃত্ত হইতে যদি কেহ কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে যারপর নাই আনন্দলাভ করিব।

নারায়ণগড় থানা,
মেদিনীপুর জেলা।
৫ই ভাদ্র, ১৩২৯ সন।

শ্রীকালীপদ চৌধুরী।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

আগড়ডাঙ্গা গ্রাম।

প্রথম খণ্ড।

আগড়ডাঙ্গা গ্রাম এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার কাটয়া-মহকুমার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত। পূর্ব্বে এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। তখনও এই গ্রাম কেতুগ্রাম থানার অধীন ছিল। তবে কেতুগ্রামের নিকটবর্ত্তী কাঁদরাগ্রামে একটী মুন্‌সেফি-আদালত ছিল; সেই আদালতে আগড়ডাঙ্গা গ্রামের দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার হইত। এই মুন্‌সেফি-আদালত কোন্ সময় উঠিয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই, তবে পুরাতন কাগজ দেখিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, ইংরাজি ১৮৪২ সালের ৯ই মে অর্থাৎ সন ১২৪৯ সালের ২৮শে বৈশাখ তারিখে মের্জা মহাম্মদ আস্কার খান নামক একজন মুন্‌সেফ কাঁদরার দেওয়ানি আদালতে বিচার করিয়াছিলেন এবং ইংরাজি ১৮৫৬ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে অর্থাৎ সন ১২৬৫ সালের ১১ই বৈশাখ তারিখে মৌলবী তোফেল আহাম্মদ নামক একজন মুন্‌সেফ কাঁদরার দেওয়ানি আদালতে বিচার করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাগজ হইতে ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, শেষোক্ত তারিখে কাঁদরার দেওয়ানি আদালতে ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী, সৈয়দ হোসেন আলি এবং নদেরচাঁদ ঘোষ নামক তিন ব্যক্তি উকিলের কার্য্য করিতেন। যে সময় কান্দরাগ্রামে দেওয়ানি আদালত ছিল, সেই সময় আগড়ডাঙ্গার ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার বীরভূম জেলার সদর সিউরিতে হইত। বীরভূম জেলার প্রথম কালেক্‌টারের নাম কিটিং সাহেব

(Christopher Keating)। তিনি ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কেরাণীরূপে কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর তারিখে তিনি বীরভূমের কালেক্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে মুর্শিদাবাদ জজ-আদালতের সিনিয়ার জজ নিযুক্ত হন, কিন্তু ঐ সালের আগষ্ট মাসের ৬ই তারিখ পর্য্যন্ত বীরভূম ত্যাগ করেন নাই।*

আগড়ডাঙ্গা গ্রাম শেষে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হয়। সেই সময় হইতে এই গ্রামের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা কাটয়ায় হইতে থাকে এবং কাঁদরাগ্রাম হইতে দেওয়ানি আদালত উঠিয়া যায়, কিন্তু কেতুগ্রাম হইতে থানা ও সাব্‌রেজেষ্টারি আফিস উঠে নাই।

রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে অন্যান্য গ্রামবাসিগণের ন্যায় আগড়ডাঙ্গা-বাসিগণ পদব্রজে সিউরি, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরীপ্রভৃতি স্থানে গমন করিত।

প্রথম রেলরাস্তা প্রস্তুত হইলে লুপলাইনের বোলপুর এবং আমদপুর আগড়ডাঙ্গা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট রেলওয়ে ষ্টেশন ছিল। বোলপুর এবং আমদপুর আগড়ডাঙ্গা হইতে ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আগড়ডাঙ্গার অধিকাংশ ব্যক্তি পদব্রজে বোলপুর যাইয়া ট্রেণে চাপিত এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ গো-শকট যোগে আমদপুর যাইয়া ট্রেণে চাপিত। সন ১৩১৯ সালে অর্থাৎ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আগড়ডাঙ্গার ১½ দেড়ক্রোশ পূর্ব্বে সালার গ্রামে রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। এই রাস্তাটী ১৯০৬ সালে প্রস্তুত হইতে আরব্ধ হয়। এই রেল লাইনের নাম বাণ্ডেল—বারহারওয়া লাইন।

* The annals of Rural Bengal, page 77, by Sir W. W. HunterK. C. S. I., M. A., LL. D.

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে আমদপুর-কাটয়া রেলরাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। আমদপুর-কাটয়া লাইনের পাঁচুণ্ডি আগড়ডাঙ্গা গ্রাম হইতে আর একটী নিকট-বর্ত্তী রেল-ষ্টেশন। পাঁচুণ্ডি আগড়ডাঙ্গার ২½ আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্দ্ধমান কাটয়া রেলরাস্তায় ট্রেণ যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহাতে আগড়ডাঙ্গা হইতে বর্দ্ধমান যাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে আগড়ডাঙ্গা হইতে ১৩ ক্রোশের মধ্যে কোন রেলওয়ে ছিল না। এক্ষণে আগড়ডাঙ্গার নিকটে তিনটী রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভাগীরথী নদী এই গ্রামের ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে প্রবাহিত হইতেছে। আগড়ডাঙ্গা গ্রামের আলেপুর নামক একটী পাড়া এক্ষণে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। আগড়ডাঙ্গা গ্রামের ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে নদীয়া জেলা এবং ৫ ক্রোশ পশ্চিমে বীরভূম জেলা। এই গ্রামের লোকের বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং বীরভূম এই চারিটী জেলার লোকের সহিত অধিক সম্বন্ধ। এই গ্রামটী মোনহর-সাহী পরগণার অন্তর্গত। মোনহর-সাহী পরগণা বহু প্রাচীন কবি ও পণ্ডিতের স্মৃতিমণ্ডিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে মোনহর-সাহী পরগণার কীর্ত্তনের দল ভারতবর্ষের সমস্ত কীর্ত্তনের দলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে এবং ইহা "মোনহর-সাহী কীর্ত্তন" বলিয়া কথিত হয়। আগড়-ডাঙ্গার পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী, ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত কাটয়া নগরে কেশব ভারতীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, চৈতন্যদেব ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মোনহর-সাহী পরগণায় আগড়ডাঙ্গা গ্রামের তিনক্রোশ পূর্ব্ব ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাটয়া মহকুমার অন্তর্গত শিঙ্গিগ্রামে মহাভারত-রচয়িতা অমর কবি কাশীরাম দাস জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীখণ্ড গ্রামে চৈতন্যদেবের সহচর

এবং পণ্ডিত নরহরি সরকার ঠাকুর এবং রঘুনন্দন সরকার ঠাকুরের জন্মস্থান। অজয়তীরবর্ত্তী কোগ্রামে চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোচনদাস এবং অগ্রদ্বীপে চৈতন্যদেবের সহচর ও পণ্ডিত গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। উদ্ধানপুরে (উদ্ধারণপুরে) চৈতন্যদেবের পারিষদ উদ্ধারণ দত্ত কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যাজিগ্রাম শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের আবাসভূমি এবং কাটয়া মহকুমার আরও অনেক গ্রামে অনেক প্রাচীন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাটয়ার নিকটবর্ত্তী বাঁদমুড়ণা গ্রামে কবি দাশরথি রায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কাটয়ার দক্ষিণ পাটলির নিকটবর্ত্তী পিলে গ্রামে বাস করেন। "বঙ্গবাসী" সংবাদ-পত্রের "পঞ্চানন্দ"-লেখক বর্দ্ধমান জজকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে অসীম স্বার্থত্যাগী সুরসিক পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাটয়া মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গাটিকুরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্থাপিত চতুষ্পাঠীতে নানাদেশের ছাত্র ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, বেদান্তপ্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে বর্ত্তমান "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার" এবং এই সভা-পরিচালিত "ব্রাহ্মণ-সমাজ" মাসিক পত্রিকার স্থাপনকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাটয়া মহকুমার মধ্যে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠী ছিল এবং এখনও অনেক চতুষ্পাঠী আছে। এই মহকুমার মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন এবং আধুনিক বৈষ্ণব-তীর্থ বর্ত্তমান আছে। এই মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরগ্রাম একটি পীঠস্থান এবং অট্টহাস একটি উপপীঠস্থান। এখনও অনেক দেশের তীর্থযাত্রী এই দুই তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন। এই মহকুমার অন্তর্গত মঙ্গলকোট গ্রাম বিক্রমাদিত্য রাজার রাজধানী ছিল। গৌড়ের বাদসাহ নাসির-উদ্দিন নসরত শাহ ৯৩০ হিজরার অর্থাৎ ১৫২১ খৃষ্টাব্দে এবং সন ৯১৮ সালে মঙ্গলকোট গ্রামে একটী

মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাচীর ও খিলানগুলি বর্ত্তমান আছে। এই মসজিদ নির্ম্মাণসময় সেকন্দর লোদি দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। কিন্তু গৌড়ের শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন না। পূর্ব্বোক্ত শ্রীখণ্ড গ্রামনিবাসী নরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দাস গৌড়ের বাদসাহ হোসেন শাহের চিকিৎসক ছিলেন। হোসেন শাহ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন; অন্য মতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় সেকন্দর লোদী ও ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। কিন্তু হোসেন সাহ তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করেন নাই,—তিনি স্বাধীন ছিলেন। কাটয়াতে মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের একটী দুর্গ ছিল। কোন শত্রু যাহাতে জলপথে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টারা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশে লুঠপাঠ করিয়া, প্রজাদিগকে যারপর নাই কষ্ট দিয়াছিল। ইহাকে লোকে "বর্গির হাঙ্গামা" বলে। কাটয়ার নিকটবর্ত্তী শাঁখাই গ্রামে, ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ, উক্ত মারহাট্টাদিগকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন। যে পলাশী-প্রান্তরে মুসলমান-ভাগ্য-রবি অস্তমিত এবং ব্রিটিশ-গৌরব-সূর্য্যের অভ্যুদয় হয়, সেই পলাশী এই কাটয়ার সাতক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে ভাগীরথীর অপর পারে অবস্থিত। কাট-য়ার নিকটবর্ত্তী দাঁইহাটের ভাস্করের কার্য্য সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই স্থানের ভাস্করগণ কর্ত্তৃক প্রস্তর-ক্ষোদিত নানা দেবদেবী মূর্ত্তি পূর্ব্বকালে জলপথে ও স্থলপথে বাঙ্গালা দেশের এবং ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। বর্দ্ধমানরাজের বর্দ্ধমান, কালনা প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত অনেক দেবদেবী মূর্ত্তি দাঁইহাটের

ভাস্করগণের নির্ম্মিত। এখনও ইহারা অনেক স্থানে দেবদেবী মূর্ত্তি প্রেরণ করিয়া থাকে। দাঁইহাট ধাতুনির্ম্মিত তৈজস বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বর্ত্তমান সময়েও দাঁইহাটের বাসন অনেক দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দাঁইহাট ভাগীরথীতীরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ভাগীরথী দাঁইহাট হইতে একক্রোশ দূরে প্রবাহিতা হইতেছেন। কাটয়ার নিকটবর্ত্তী শাঁখাই বা শাঁকারি গ্রাম ভাগীরথী ও অজয়নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, এই গ্রামের ভাগীরথীর ঘাটে গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিপরিগ্রহ পূর্ব্বক জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যারূপে পরিচয় দিয়া, জনৈক শঙ্খবণিকের নিকট শঙ্খ পরিয়াছিলেন। প্রাচীন কাল হইতে কাটয়া বাণিজ্যের একটী কেন্দ্রস্থল। পূর্ব্বকালে কাটয়ার তসর বস্ত্র বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কাটয়ায় বহুসংখ্যক ধনশালী বণিক বাস করিতেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রত্যেক বাণিজ্যকেন্দ্রেই কাটয়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীবাটীর চন্দ্রদের (চঁদদের) গদি ছিল। প্রবাদ আছে যে, জগৎ শেঠ ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ী বাঙ্গালাদেশে শ্রীবাটীর চন্দ্রদের অপেক্ষা ধনী ছিলেন না। ইঁহারা গন্ধবণিক, ছত্রিশ আশ্রম, চন্দ্র উপাধিধারী এবং লোকে চঁদ বলিয়া থাকে। কাটয়ায় রামধন মল্লরীপ্রভৃতি অনেকেই শ্রীবাটীর চঁদদের অনুগ্রহে ধনবান হইয়াছিলেন। ইংরাজ রাজত্বকালেও এক সময়ে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, বর্দ্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বণিকদিগকে কাটয়া হইতে লবণ সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু কালক্রমে রেল রাস্তা প্রস্তুত হওয়ায় অনেক অখ্যাত স্থান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ফলে কাটয়া ও কালনার বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এক্ষণে কাটয়া, ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া, বর্দ্ধমান-কাটয়া এবং অমদপুর-কাটয়া—এই তিনটী রেলরাস্তার মিলনস্থল এবং সময় সময় কাটয়াতে মাল-ষ্টীমার আসিয়া থাকে। তথাপি আর কাটয়ায় বাণিজ্যের পূর্ব্বোন্নতির আশা নাই।

কাটয়া ভাগীরথী ও অজয়নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত;—এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালে জলপথে ও স্থলপথে কাটয়ায় পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইত।

কাটয়া মহকুমার মধ্যে বৈষ্ণবদিগের অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে। সেই সমস্ত স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে অগ্রদ্বীপ, উদ্ধারণপুর (উদ্ধানপুর) এবং বৈরাগীতলার মেলায় বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কলিকাতাপ্রভৃতি বাণিজ্যপ্রধান স্থানের বণিকগণ এই সমস্ত মেলায় পণ্যদ্রব্য আমদানি করিয়া থাকেন। এই সমস্ত মেলায় বহুসংখ্যক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি অন্নক্ষেত্র খুলিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত কাহাকেও অনশনে কষ্ট পাইতে হয় না।

কাটয়া মহকুমার মধ্যে কাটয়া, দাঁইহাট ওকোয়সাহা, মাথরুণ, শ্রীখণ্ডগ্রামে এবং কাটয়ার নিকটবর্ত্তী বনয়ারিবাদ, সালার এবং কাগ্রাম গ্রামে একটী করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। গঙ্গাটিকুরীপ্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি চতুষ্পাঠী আছে। কাটয়ায় একটী গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় আছে। স্কুলসমূহের ডেপুটি-ইনস্‌পেক্টার এবং সাব-ইনস্‌পেক্টার কাটয়ায় অবস্থিতি করেন। বর্দ্ধমান-কলেজ, বহরমপুর-কলেজ এবং কৃষ্ণনগর-কলেজ কাটয়া হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

কাটয়ার "সেবাশ্রমে" অনাথ, পীড়িত ও রুগ্ন ব্যক্তিগণের সেবা, শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হইয়া থাকে।

সন ১৩২৬ সালের ২১ শে ভাদ্র বেলা ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় কাটয়াতে "প্রসন্নময়ী থিওসফিক্যাল হল" স্থাপিত হইয়াছে। "উপনিষৎ," "গীতায় ঈশ্বরবাদ" প্রভৃতিগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বেদান্তরত্ন মহোদয় এই সময়ে এই নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই

থিওসফিক্যাল হল স্থাপনের সময় সন ১৩২৬ সালের ২০শে এবং ২১শে ভাদ্র তারিখে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম. এ বেদান্তরত্ন, বরদা-রাজ্যের ডিরেক্‌টার অব্ পাব্‌লিক ইনস্‌ট্রাকসন, বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ. (ক্যানটার), উত্তরপাড়া কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিত্র এম. এ. বি. এল প্রভৃতি অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি কাটয়ায় উপস্থিত হইয়া এই থিওসফিক্যাল হল স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি-সাধন ইহার উদ্দেশ্য।

কাটয়ায় একটী টাউন হল ও পুস্তকাগার আছে। কাটয়া হইতে “প্রসূন” নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইয়া থাকে। কাটয়ার ছাপাখানা হইতে এ অঞ্চলের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। কাটয়ায় দেওয়ানি আদালত, ফৌজদারি আদালত, সব-রেজেষ্টারি আফিস, মিউনিসিপাল আফিস, একটী থানা, দুইটী পোষ্টাফিস এবং একটী টেলিগ্রাফ আফিস আছে। কাটয়ার সমীপবর্ত্তী দাঁইহাটেও একটী মিউনিসিপ্যাল আফিস আছে।

স্বদেশহিতৈষী, দানশীল, ধার্ম্মিক, কাশিমবাজার-নিবাসী মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং বহরমপুরের সুবিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন বরাট প্রভৃতি অনেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি এই কাটয়া মহকুমাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কাটয়া মহকুমাতে মোট ৩৭১টী মৌজা বা গ্রাম আছে। এই মহকুমার পরিমাণ ৪১১ বর্গ-মাইল এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ সন ১৩১৮ সালের গণনা অনুসারে ইহার লোক সংখ্যা ২৬১৪৬৩ জন। এই মহকুমাটী কাটয়া, কেতুগ্রাম এবং মঙ্গলকোট—এই তিনটী থানায় বিভক্ত। কাটয়া থানার মধ্যে ১২৫টী মৌজা বা গ্রাম আছে। এই

থানার পরিমাণ ১৩১ বর্গ-মাইল এবং লোক-সংখ্যা (১৯১১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে) ৯৪৯৫৫ জন। কেতুগ্রাম থানার মধ্যে ১১৮টী মৌজা অর্থাৎ গ্রাম আছে। এই থানার পরিমাণ ১৩৬ বর্গ-মাইল এবং লোক সংখ্যা ৮৯৬৭৩ জন। মঙ্গলকোট থানায় ১২৮টী মৌজা বা গ্রাম আছে। এই থানার পরিমাণ ১৪৪ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা ৭৬৪৩৫ জন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কেতুগ্রাম থানার মধ্যে ৪৪০৫৬ জন পুরুষ, ৪৫৬১৭ জন স্ত্রীলোক বাস করিত; ইহার মধ্যে হিন্দু পুরুষ ৩৩৪৭৩ জন, হিন্দু স্ত্রীলোক ৩৪৭৩৫ জন, মুসলমান পুরুষ ১০৫৮২ জন, মুসলমান স্ত্রীলোক ১০৮৮২ জন, খৃষ্টান পুরুষ ১ জন, (খৃষ্টান স্ত্রীলোক ছিল না)। এইবৎসর কেতুগ্রাম থানার মধ্যে ৬৮৪১ পুরুষ এবং ১১৮ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিত, তাহার মধ্যে ৬৬২ জন পুরুষ এবং ২ জন স্ত্রীলোক ইংরাজি জানিত। সেই সময় কাটয়া থানার মধ্যে ১০৪২৬ জন পুরুষ এবং ৮৬১ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিত; তাহার মধ্যে ২০২৫ জন পুরুষ এবং ১৬ জন স্ত্রীলোক ইংরাজি জানিত। সেই সময় মঙ্গলকোট থানার মধ্যে ৬৮৪৮ জন পুরুষ এবং ৪৪৪ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিত, তাহার মধ্যে ৫৬৭ জন পুরুষ এবং ৩ জন স্ত্রীলোক ইংরাজি জানিত। এই বৎসর (১৯১১ খৃষ্টাব্দে) সমস্ত কাটয়া মহকুমায় ২৩৯১৫ জন পুরুষ এবং ১৪২৩ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিত; ইহার মধ্যে ৩২৫৪ জন পুরুষ এবং ২১ জন স্ত্রীলোক ইংরাজি জানিত।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কাটয়া থানার পরিমাণ ১৪২ বর্গ-মাইল, গ্রাম-সংখ্যা ১৫৭, ঘর-সংখ্যা ১৯৩৬৩ এবং লোক-সংখ্যা ৮৩০৯৯ ছিল। ঐ সময় কেতুগ্রাম থানার পরিমাণ ১৪৫ বর্গ-মাইল, গ্রাম-সংখ্যা ২৪৯, ঘর-সংখ্যা ১৮৬০৮ এবং লোক-সংখ্যা ৮২০৬৪ ছিল। সেই সময় মঙ্গলকোট থানার পরিমাণ ১২০ বর্গমাইল, গ্রাম-সংখ্যা ১৭১, ঘর-সংখ্যা ১৭০৭২

এবং লোক-সংখ্যা ৭৭৬৫৫ ছিল। এই সময় কাটয়া নগরে (টাউনে) ৬৮১৭ জন হিন্দু, ১১৩১ জন মুসলমান, ১৫ জন খৃষ্টান এবং মোট ৭৯৬৩ জন লোকের বাস ছিল। এই সময় দাঁইহাট টাউনে (নগরে) ৭৩৮৯ হিন্দু, ১৭৩ জন মুসলমান এবং মোট ৭৫৬২ জন লোক বাস করিত। দাঁইহাটে ইহা ছাড়া অন্য কোন জাতির বাস ছিল না।

কাটয়ার ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত মহকুমায় কেতুগ্রাম থানার মধ্যে আগড়ডাঙ্গা গ্রাম অবস্থিত। বর্ত্তমান আগড়ডাঙ্গা গ্রামের অর্দ্ধ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে আগড় নামক একটী পুষ্করিণীর অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। এই লুপ্ত প্রায় পুষ্করিণীটী শীঘ্রই ধান্যের জমিতে পরিণত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। আগড়পুষ্করিণী কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। আগড়ডাঙ্গা গ্রাম স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে আগড়পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে ধান্যক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে একটী বৃহৎ ডাঙ্গা ছিল। উক্ত ডাঙ্গা আগড়ডাঙ্গা নামে খ্যাত ছিল। ডাঙ্গাটীতে তখন আদৌ মনুষ্যবাস ছিল না। সর্ব্ব প্রথমে একজন ব্রাহ্মণ, একজন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ও জনৈক আউট আশ্রম গন্ধবণিক গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া এই বিস্তৃত ডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। উক্ত আদি ব্রাহ্মণ অধিবাসীর বংশেই বর্ত্তমান পুস্তকের লেখক শ্রীকালীপদ চৌধুরীর জন্ম এবং শ্রীরাজচন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীআশুতোষ চন্দ্র উক্ত গন্ধবণিকের বংশধর। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চন্দ্র কিন্তু উক্ত বংশোদ্ভূত নহেন। পূর্ব্বোল্লিখিত কায়স্থ অধিবাসীর বংশ এক্ষণে লোপ পাইলেও ৺রামচন্দ্র দত্ত উক্ত কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ডাঙ্গার আদিম নিবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বণিকের নাম নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। এই তিন ব্যক্তির বসতি স্থাপনের পর, ক্র[illegible] নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া, এই ডাঙ্গায় বাস করিতে [illegible] এবং এইরূপে এই ডাঙ্গাটী একটী গ্রামে

পরিণত হইল। সেই সময় হইতে "আগড়ভাঙ্গা" বলিতে কোন ডাঙ্গার নাম না বুঝাইয়া একটি গ্রামের নাম বুঝাইত। এইরূপে আগড়ভাঙ্গা গ্রামের সৃষ্টি হইল।

আগড়ভাঙ্গা গ্রাম কোন্ সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। তবে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রামের অস্তিত্ব ছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই গ্রামের "মঙ্গলচণ্ডীতলা" নামক দেবালয়ে, "কাঁদফোলা" পাড়ায় "গাছতলা" নামক স্থানে এবং পূর্ব্বপাড়ায় শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ পণ্ডিতের বাটীতে, চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণবর্ণপ্রস্তর-খোদিত এই বিষ্ণুমূর্ত্তি তিনটী এরূপ সুঠাম ও নয়নাভিরাম যে, ইঁহাদের নির্ম্মাতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই মূর্ত্তিগুলির নাশাগ্রভাগ ছেদিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেকটীর কোন না কোন অঙ্গ ভঙ্গ। এই মূর্ত্তিগুলিকে কেহ বাসুদেবমূর্ত্তি, কেহ ষষ্ঠীমূর্ত্তি বলিয়া থাকে। যাহারা ইতিহাসের নাম পর্য্যন্ত জানিত না, কালাপাহাড় কে তাহা বুঝিত না, এরূপ অশিক্ষিত প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কালাপাহাড় কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তিগুলির অঙ্গহানি করা হইয়াছে। তাহারা বলিত যে, এ কথা তাহারা তাহাদের পিতা, পিতামহ এবং তদ্রূপ অন্যান্য প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিয়াছে। তাহারা এ সম্বন্ধে এই প্রবাদ বাক্যটীর উল্লেখ করিত,—

"কালাপাহাড়ের কাটা,
বিরূপাক্ষের ফাটা;
সাক্ষী তার মদনমোহন,
তিন ঠাঁই তাঁর বাঁকা।"

এক্ষণে কালাপাহাড় কে এবং তিনি কোন্ সময়ে ঐ মূর্ত্তিগুলি ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আগড়ডাঙ্গা গ্রাম বর্ত্তমান ছিল। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে স্বাধীন পাঠান রাজ্য ছিল এবং প্রায় তাঁহাদের সকলেরই গৌড়ে রাজধানী ছিল; তবে রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র মোট ৪০ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং হাবসিগণ প্রায় সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। মোগলকুলগৌরব সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আকবর বাদসাহের সংশ্রব ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঠানজাতীয় সুলেমান কররাণী বাঙ্গালায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কররাণী প্রাচীন গৌড়নগর হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া রাজমহলের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে তাণ্ডানগর সংস্থাপন করিয়া, তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই তাণ্ডানগরী এক্ষণে ভাগীরথী-গর্ভে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন পাটুলীগ্রামে কোন ব্রাহ্মণবংশে নিরঞ্জন রায় (মতান্তরে রাজু বা রাজকৃষ্ণ) নামে একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। এই নিরঞ্জন রায় শেষে ইতিহাস-বিখ্যাত কালাপাহাড় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। নিরঞ্জন রায় নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের দৌহিত্র হরদেব ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায় ও জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি মিথিলায় ন্যায়ের কোন কোন পুস্তক পাঠ করেন এবং কাশীতে বেদান্ত, মীমাংসা ও সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি আরবী ও পার্শি ভাষাতেও বিলক্ষণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নিরঞ্জন কেবল বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা নহে, শস্ত্রবিদ্যায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন।

তিনি মল্লযুদ্ধ, অসি ও তীরচালনা প্রভৃতি সুন্দরভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একজন পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে দৈহিক রূপ-লাবণ্যদানেও কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি দেখিতে পরম সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক ছিলেন। নিরঞ্জন পণ্ডিত এবং গোঁড়া হিন্দু হইলেও, বঙ্গাধিপতি সুলেমান কররাণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাজ খাঁর কন্যা নজিরণের প্রণয়ে পড়িয়া সন ৯৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ঐ জ্যৈষ্ঠ মাসেই নজিরণের সহিত মহাসমারোহে তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর হইতেই তিনি হিন্দু-দেবদেবীর ভয়ানক শত্রু হইয়া উঠেন। বঙ্গাধিপতিও তাঁহাকে কালাপাহাড় উপাধি প্রদান করেন ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বাঙ্গালাদেশে এবং উড়িষ্যায়, হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রায় সমস্ত চূর্ণ করিয়াছিলেন, কিম্বা আংশিক ভঙ্গ করিয়াছিলেন। আগড়ডাঙ্গা গ্রামের তিনটী বিষ্ণুমূর্ত্তির বিকৃতাবস্থাই কালাপাহাড়ের পরধর্ম্ম বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রবাদ আছে যে, কালাপাহাড়ের শিশু পুত্র হস্তীকর্ত্তৃক আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং শিশুর জননী নজিরণ এই সংবাদ পাইয়া, রাজপ্রাসাদ হইতে বেগে নামিয়া আসিবার সময়, পদস্খলিত হইয়া পতিত হওয়ায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল এবং শেষে কালাপাহাড় পাগল হইয়াছিল।

আগড়ডাঙ্গা গ্রামের পশ্চিমদিকে ধান্যক্ষেতের মধ্যে খেকুরডাঙ্গা, ডমুয়া পুষ্করিণী, "কেষ্টারায়ের পুকুর' নামক পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ঐ সমস্ত স্থানে ধান্যক্ষেত্র ছিল না, লোকের বাস ছিল। খেকুরডাঙ্গায় একটী ধনবান লোকের অট্টালিকা ছিল; ডমুয়া এই অট্টালিকা সংলগ্ন একটী বৃহৎ পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণী এত বৃহৎ যে ইহাকে একটী নদীর অংশ বলিয়া মনে হয়। এক্ষণেও ডমুয়াতে (ডমো) একটী ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। খেকুরডাঙ্গার ভগ্ন অট্টালিকার ভিত্তিতে গুপ্তধন

আছে বলিয়া পূর্ব্বে লোকে বিশ্বাস করিত। এই ভগ্ন অট্টালিকার ইষ্টক লইয়া অনেকে বাটীপ্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এক্ষণে এই খেকুরডাঙ্গা ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং ডমুয়া (ডমো) পুষ্করিণীর কতক অংশ ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং কতক অংশ এখনও জলাশয়রূপে বর্ত্তমান আছে। ডমুয়ার জলবায়ু পূর্ব্বে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ছিল। এক্ষণে এই পুষ্করিণী শৈবাল, পানা, শোলাপ্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু জল নির্ম্মল, তবে কেহ এই জল পান করে না। কৃষকেরা এই পুষ্করিণীর জল ক্ষেত্রে সিঞ্চন করিয়া ধান্য প্রভৃতি শস্য রক্ষা করিয়া থাকে।

কেষ্টারায়ের পুকুরের নিকটে আগড়ডাঙ্গার রায়েদের বাটী ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এই পুষ্করিণী তাঁহার বাটী সংলগ্ন ছিল। এক্ষণে এই পুষ্করিণীর নিকটে একটীও লোকালয় নাই, কেবল ধান্যক্ষেত্র। কৃষকেরা এই পুষ্করিণীর জল ধান্যক্ষেত্রে সিঞ্চন করিয়া ধান্য রক্ষা করিয়া থাকে। আগড়ডাঙ্গা গ্রামের চতুর্দ্দিকে এবং মধ্যে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে এবং গ্রামের মধ্যে কোনস্থানে মৃত্তিকা খনন করিবার সময় ইষ্টক বহির্গত হয়। এই সমস্ত কারণে বোধ হয় যে, এই গ্রামে পূর্ব্বে অনেক ধনবান ব্যক্তির বাস ছিল।

আগড়ডাঙ্গা গ্রামের উচুণ্ডিপাড়ায় এক্ষণে কেবল মুসলমান বসতি দৃষ্ট হয়। উচুণ্ডিতে একঘরও হিন্দু নাই। আলেপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামটীও মুসলমান বসতিতে পরিপূর্ণ। উচুণ্ডি এবং আলেপুরের মধ্যস্থলে পানকলা নামে একটী পুষ্করিণী আছে। উচুণ্ডির চৌধুরী একরাম আলি মির্জ্জা সাহেব এক্ষণে ঐ পুষ্করিণীর অধিকারী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার ঐ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছিল। সেই সময় ঐ পুষ্করিণীর মধ্যে একটী বিম্বকাষ্ঠ প্রোথিত অবস্থায় দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ বিম্বকাষ্ঠের নিকটে কয়েকটী মৃন্ময় পাত্রে কড়ি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সমস্ত দ্রব্য পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা

করিবার সময় পুষ্করিণীগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। এই হেতু অনুমিত হয় যে, পানফলা পুষ্করিণী কোন হিন্দু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং উচুণ্ডিতে হিন্দু বসতি ছিল।

উচুণ্ডি সংলগ্ন আলেপুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহাকে আগড়ডাঙ্গার অংশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আলেপুরের কটুমিঞার বাটীতে একটী ভগ্ন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-খোদিত বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হইত। কথিত আছে যে, এই মূর্ত্তিটী, আলেপুর ও খাঁয়েরাগ্রামের মধ্যস্থিত বেঁয়ে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবার সময়, পঙ্কমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। * ইহাতে বোধ হয় যে, আলেপুর গ্রামে পূর্ব্বে হিন্দু ছিল।

আগড়ডাঙ্গা গ্রামে ভট্টাচার্য্যদের বাটীতে পূর্ব্বে চতুষ্পাঠী ছিল। সেই চতুষ্পাঠীতে অনেক স্থানের ছাত্র পাঠ করিত। ভট্টাচার্য্যদের বংশ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। আগড়ডাঙ্গার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যদের দৌহিত্র-বংশোৎপন্ন।

আগড়ডাঙ্গা গ্রামের গ্রহাচার্য্যদের বাটীতে জ্যোতিষের যথেষ্ট চর্চ্চা হইত।

পূর্ব্বে আগড়ডাঙ্গা গ্রামে তন্ত্রের আলোচনা ছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণ এবং গ্রহাচার্য্যগণ তান্ত্রিক ছিলেন। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়দের দৌহিত্র-বংশীয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই বংশ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আগড়ডাঙ্গাগ্রামের ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বের ন্যায় সকলেই এক্ষণে শাক্ত।

আগড়ডাঙ্গাগ্রামে পূর্ব্বে সমস্ত হিন্দু-জাতির বাস ছিল। এক্ষণে

---

* কটুমিঞার মঞ্জুরহোসেন নামক একটী পুত্র ছিল। মঞ্জুরহোসেনের মৃত্যুর পর এই বংশটী লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, গ্রহাচার্য্য, গন্ধবণিক, ময়রা, সৎগোপ, নাপিত, তাঁতি, কর্ম্মকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার, কলু, চালতি শুঁড়ি, মদো শুঁড়ি, শুঁড়ির ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ধোবা, ডুলেবাগ্দি, * হাড়ি, মুচি এবং মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন জাতির বাস নাই।

পূর্ব্বকালে আগড়ডাঙ্গা একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল। এই গ্রামের গন্ধবণিকদের দোকান হইতে, অনেক গ্রামের লোক জিনিষ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। আগড়ডাঙ্গার মোদকদের বিখ্যাত মিষ্টান্নের দোকান ছিল। এই গ্রামে সপ্তাহে দুইবার হাট হইত। এই হাট হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তরকারি, কাপড়, মিষ্টান্ন, জুতাপ্রভৃতি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। আগড়ডাঙ্গার কাপড় তৎকালে বিখ্যাত ছিল। সিমুলিয়া, কিম্বা সোনারুন্দির তাঁতিরা তৎকালে আগড়ডাঙ্গার তাঁতিদের মত কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিত না। রায়েদের বড় পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটী বৃহৎ ময়দান ছিল; তথায় হাট বসিত। এই ময়দানে বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ, বটপ্রভৃতি বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষগুলি জনৈক মুসলমান জমিদার কর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি রাস্তা-পার্শ্বস্থ ও মাঠের পুষ্করিণী-তীরস্থ অনেক "প্রতিষ্ঠা করা" বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়াছেন। সেই সময় হিন্দুগণ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিল, কিন্তু জমিদারের ভয়ে কিছু বলিতে না পারিয়া, তাহারা নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে ঐ সমস্ত বৃক্ষ কর্ত্তন করা দেখিয়াছি এবং অপর হিন্দুগণের ন্যায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছি।

---

* অন্যস্থানে ইহাদিগকে ডুলে বলে। ডুলেবাগ্দি বলে না।

মঙ্গলচণ্ডী আগড়ডাঙ্গার গ্রাম্যদেবী। যে সময়ে আগড়ডাঙ্গা গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল,সেই সময় হইতে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা চলিয়া আসিতেছে। প্রথমে এই মঙ্গলচণ্ডীকে আগড়চণ্ডী বলিত। তবে প্রথম হইতেই মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান দ্বারা ইঁহার পূজা হইয়া আসিতেছে। বর্দ্ধমান রাজবংশের কোন প্রাচীন ভূপতি, —সম্ভবতঃ মহারাজাধিরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর, কিছু নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন, সেই জমির আয় হইতে মঙ্গলচণ্ডী-দেবীর নিত্যপূজা চলিয়া আসিতেছে। মঙ্গলচণ্ডী-দেবীর কোন মূর্ত্তি নাই। একটী বেদীতে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। আনুমানিক সন ১২২৬ সালে কিম্বা তাহার কিছু পরে আগড়ডাঙ্গার শ্রীহরিদাস মোদকের পূর্ব্বপুরুষদের কোন বিধবা কিছু টাকা দান করায়, গ্রামের ভদ্রলোকেরা মঙ্গলচণ্ডীর জীর্ণ বেদীটীর সংস্কার করাইয়াছিলেন। ইষ্টক-নির্ম্মিত বেদী এখনও বর্ত্তমান আছে। তবে ঐ বেদীর উপর অনেক বৃক্ষ জন্মিয়াছে। ঐ সকল বৃক্ষ পূজককে ছায়া দান করিয়া থাকে। সেইজন্য বৈশাখ মাসের রৌদ্রে পূজা করিতে কিম্বা চণ্ডীপাঠ ও হোম করিতে কোন কষ্ট হয় না। ঐ বৃক্ষগুলি বেদীটীকে অতি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। ঐ ছোট ছোট গাছগুলির উপরে কয়েকটী সুগন্ধ পুষ্পযুক্ত লতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুগন্ধি পুষ্পশোভিত লতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি মঙ্গলচণ্ডী-দেবীর বেদীটীকে একটী লতামণ্ডপে পরিণত করিয়াছে। ঐ স্থানটীকে লোকে মঙ্গলচণ্ডীতলা বলিয়া থাকে। মঙ্গলচণ্ডীতলায় একটী শিবালয় আছে। এই শিবালয়ে প্রত্যেক বৎসর চৈত্র মাসের শেষে পাঁচ, ছয় দিন শিবপূজা হইয়া থাকে। ইঁহাকে গাজনের শিব বলে। এই পূজার সময় একদিন এই শিবকে, এতদঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের শিবের সহিত, উদ্ধানপুরের নিকটবর্ত্তী শাঁখাই বা শাঁখারি গ্রামে ভাগীরথী-গর্ভে লইয়া গিয়া গঙ্গাস্নান করান হইয়া থাকে। এই কয় দিনের মধ্যে এক রাত্রিকে জাগরণের রাত্রি বলে। এই রাত্রিতে

গ্রামের সমস্ত লোক মঙ্গলচণ্ডীতলায় গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়া থাকে,—কেহ নিদ্রা যায় না। জাগরণের রাত্রিতে আগড়ডাঙ্গার এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নরমুণ্ড ও শিশুর মৃতদেহ লইয়া মঙ্গলচণ্ডী-তলায় গীত গাহিয়া থাকে এবং নৃত্য করিয়া থাকে,—ইহাকে "শকুনি-খেলা" বলে। ইহারা পর দিন প্রাতে অর্থাৎ "জল-সন্ন্যাস-দিবসে" গাজনের শিবের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে। এই জল-সন্ন্যাস-দিবসে গ্রামের ইতর ভদ্র সমস্ত লোক শিবের সহিত নৃত্য করিতে করিতে গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। তবে লোকের অভাব বৃদ্ধি ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ আমোদ কমিয়া আসিতেছে। শিবের সন্ন্যাসীদিগকে এতদঞ্চলে ভক্ত বলিয়া থাকে। ভক্তগণ গাজনের শিবের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিয়া থাকে। জল-সন্ন্যাস-দিবস প্রাতে গ্রামের লোকেরা গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত হইতে মঙ্গলচণ্ডীতলা পর্য্যন্ত জল ছিটাইয়া ধূলা নষ্ট করে এবং ঝাঁট দিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই রাস্তার উপর দিয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের শিবকে আনিয়া আগড়ডাঙ্গার শিবের সহিত গঙ্গাস্নান করাইতে উদ্ধানপুরের নিকটবর্ত্তী শাঁখাইএর ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। সেই সময় লোকে শিবের দোলে কাঁচা আম্র প্রদান করিয়া থাকে। চৈত্রমাসের শেষ দিবসে শিবমন্দিরে শিবের নিকট যজ্ঞ করা হইয়া থাকে এবং ভোগ রন্ধন করিয়া শিবের ভোগ দেওয়া হয়। ভোগ রন্ধনের সময় যে দিকে ভোগের ফেন প্রথমে উৎলাইয়া পড়ে, লোকের বিশ্বাস যে, সে বৎসর সর্ব্ব প্রথমে সেই দিকের মাঠে "কারান" অর্থাৎ সুবৃষ্টি হইবে এবং ধান্য ভাল জন্মিবে। এই দিবস মঙ্গলচণ্ডীতলায় একটী ছাগ বলি হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানের কোন ভূতপূর্ব্ব মহারাজ প্রদত্ত ভূমির আয় হইতে গাজনের

শিবপূজার সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আগড়ডাঙ্গার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় পুরুষানুক্রমে ৺মঙ্গলচণ্ডীর ও গাজনের শিবের নিত্যপূজা করিয়া আসিতেছেন।

দুর্গোৎসবের সময়, মহাসপ্তমী ও মহানবমী পূজার দিন বলিদানের পর গ্রামের ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সমস্ত লোক গ্রহাচার্য্যদের পূজাবাটীতে অশ্লীল ভাষায় গান গাহিত ও নৃত্য করিত এবং গ্রহাচার্য্যদের ঠাকুরবাটী হইতে মঙ্গলচণ্ডীতলা পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা অশ্লীল ভাষায় গান করিতে করিতে ও নৃত্য করিতে করিতে গমন করিত। কালিকাপুরাণের একষষ্টিতম অধ্যায়ের অষ্টাদশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত শ্লোক পাঁচটীর ভুল অর্থ লোকে গ্রহণ করায় এই কুপ্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। অনুবাদসহ শ্লোক পাঁচটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

অন্ত্যপাদো দিবাভাগে শ্রবণস্য যদা ভবেৎ।
তদা সম্প্রেষণং দেব্যা দশম্যাং কারয়েদ্বুধঃ॥
সুবাসিনীভিঃ কুমারীভির্বেশ্যাভির্নর্ত্তকৈস্তথা।
শঙ্খতূর্য্যনিনাদৈশ্চ মৃদঙ্গৈঃ পটহৈস্তথা॥
ধ্বজৈর্ব্বস্ত্রৈর্ব্বহুবিধৈর্লাজপুষ্পপ্রকীর্ণকৈঃ।
ধূলিকর্দ্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ॥
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতিকৈঃ।
ভগলিঙ্গাদিশব্দৈশ্চ ক্রীড়য়েয়ুরলং জনাঃ॥
পরৈর্নাক্ষিপ্যতে যস্তু যঃ পরান্নাক্ষিপেদ্ যদি।
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য শাপং দদ্যাৎ সুদারুণম্॥

উপরোক্ত শ্লোক পাঁচটীর বঙ্গানুবাদ:—

"যে দশমী তিথির দিবাভাগে শ্রবণার শেষপাদ হইবে, সেই দশমী তিথিতেই দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। রাগনিপুণ কুমারী ও বেশ্যা এবং

নর্ত্তকগণ সঙ্গে লইয়া শঙ্খ, তুরী, মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া, খই ও ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে, ধূলিকর্দ্দম নিক্ষেপ করত নানা ক্রীড়া-কৌতুক ও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক ভগ-লিঙ্গাদি বাচক গ্রাম্যশব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ-শব্দ-বহুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল বাক্যালাপ করিয়া বিসর্জ্জন সময়ে ক্রীড়া করিবে। সেই দিবস যদি কোন মনুষ্য, নিজের উপর অপর কর্ত্তৃক অশ্লীল ব্যবহার করা না ভালবাসে এবং অপরের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে না চাহে, তবে ভগবতী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া গমন করেন।"

কালিকাপুরাণে এই অশ্লীল প্রথার ব্যবস্থা, কেবল বিজয়া-দশমীর দিবসে প্রতিমা বিসর্জ্জন সময়ের জন্যই দৃষ্ট হয়। মহাসপ্তমী ও মহানবমী পূজার দিনে এরূপ অশ্লীল প্রথার ব্যবস্থা কালিকাপুরাণে দৃষ্ট হয় না। সন ১৩২৫ সালে, ২৭শে আশ্বিন, সোমবারে, মহানবমী পূজার বলিদানের পর, আচার্য্যদের পূজাবাটীতে এবং রায়েদের বাটীর নিকটবর্ত্তী রাস্তায়, লোকে অশ্লীল ভাষায় গান করিতে আরম্ভ করিলে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় তাহাদিগকে ঐ রূপ অশ্লীল ভাষায় গান করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু নিষেধ না শুনায়, শ্রীমাখনচন্দ্র ঘোষের পুত্র শ্রীকানাই ঘোষের সহিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়ের ঝগড়া হয় এবং পূজার পর শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ রায়ের পিতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় শ্রীকানাই ঘোষ ও শ্রীধর্ম্মদাস ঘোষের নামে কাটয়াতে ফৌজদারি আদালতে নালিশ করেন। সেই মোকদ্দমা শ্রীকানাই ঘোষের পিতা মাখনচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করে। পর বৎসর, সন ১৩২৬ সালের দুর্গোৎসবের সময়, কেহ কোন স্থানে অশ্লীল ভাষায় গান করে নাই। এইরূপে এই কুপ্রথাটী

উঠিয়া গিয়াছিল। উপরোক্ত মোকদ্দমাই এই অন্নীয় প্রথা উঠিয়া যাইবার একমাত্র কারণ।

আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীপাড়া হইতে আরম্ভ হইয়া, যে রাস্তা দক্ষিণ খণ্ড ও বনয়ারিবাদের মধ্য দিয়া, কাম্যবনের নিকট কাটয়া-সিউরি রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই রাস্তাটী সন ১২৮১ সালের দুর্ভিক্ষের সময় প্রস্তুত হইয়াছিল। অনেক দরিদ্র ব্যক্তি এই রাস্তা প্রস্তুত করিয়া, মজুরি স্বরূপ চাউল লইয়া, দুর্ভিক্ষের সময় জীবন রক্ষা করিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় টাকায় ১৬ যোল সের চাউল বিক্রীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ের মত পূর্ব্বে প্রজাকে চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে হইত না। আগড়ডাঙ্গা গ্রামে পূর্ব্বে ১১ এগার জন চৌকিদার ছিল। তাহারা বেতনের পরিবর্ত্তে একশত পাঁচ বিঘা জমি ও ছয়টা পুষ্করিণী ভোগ করিত। মুসলমানরাজত্ব-সময় হইতে চৌকিদারগণ চাকরাণ জমি ভোগ করিয়া আসিতেছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আগড়ডাঙ্গার চৌকি-দারগণ জমির পরিবর্ত্তে বেতন ভোগ করিতেছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সাতজন চৌকিদার নিযুক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা প্রত্যেকে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আগড়ডাঙ্গায় কেবল দুইজন চৌকি-দার ছিল। তাহারা প্রত্যেকে মাসিক ছয় টাকা করিয়া বেতন পাইত।

সন ১২৭৬ সালে আগড়ডাঙ্গায় ৩৬ ছত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণ, দুই ঘর কায়স্থ, একঘর রাজপুত (ক্ষত্রিয়) এবং অন্যান্য জাতির বাস ছিল। সন ১৩২৬ সালে নয় ঘর মাত্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল এবং কায়স্থ ও রাজপুতের বাস একেবারেই ছিল না।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের মানুষ-গণনায় আগড়ডাঙ্গায় ১৯৬০ জন লোকের বাস দৃষ্ট হইয়াছিল।

সন ১৩১২ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের কলেরারোগে আগড়ডাঙ্গায়

ত্রিশজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই কলেরায় তারিণী-প্রসাদ চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর পত্নী ও দুই পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই শোকে তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্র অচ্যুতানন্দ চৌধুরীর মস্তকের পীড়া হইয়াছিল।

সন ১৩২৫ সালে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী এক মারীভয় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাকে যুদ্ধজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিত। এই সময়ে জার্ম্মাণীর সহিত ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের যুদ্ধ হইতেছিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এই পীড়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, এইজন্য ইহাকে যুদ্ধজ্বর বলিত। এই পীড়ায় সন ১৩২৫ সালে আগড়ডাঙ্গা গ্রামে চারি শত একান্ন জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। মৃতদেহ সৎকারজন্য গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার লোকাভাবে, চালতি সাহার (শুঁড়ির) মৃতদেহ, দশটাকা মজুরি দিয়া, বাগ্দিজাতির দ্বারা গঙ্গাতীরে প্রেরিত হইয়াছিল। এই পীড়ায় গোরীব ঘোষ নামক চৌধুরীদের একজন হিতৈষী প্রতিবেশীর মৃত্যু হইয়াছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ সন ১৩২৭ সালের মানুষ-গণনায় আগড়ডাঙ্গা গ্রামে মোট ১১০০ একাদশ শত লোকের বাস ছিল। তন্মধ্যে ৫০০ শত পুরুষ এবং ৬০০ শত স্ত্রীলোক। এই সমস্ত সংখ্যা হইতে বোধ হইতেছে যে, আগড়ডাঙ্গা গ্রাম এক্ষণে ধ্বংসোন্মুখ।

আগড়ডাঙ্গা চৌধুরী-বংশ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি ! নমোঽস্তুতে ॥
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্র চিত্তা ॥ (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)।

রাঢ়শ্রেণী বা রাঢ়ী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি।

সেনবংশীয় প্রথম রাজা বঙ্গাধিপ আদিশূর * পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত ৯৯৯ সংবতে, অর্থাৎ সন ৩৪৯ সালে বা ৯৪২ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড়—এই পাঁচ জন বেদজ্ঞ, ক্রিয়াশীল, সর্ব্বগুণান্বিত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ-গোত্রজ, ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য-গোত্রজ, দক্ষ কাশ্যপ-গোত্রজ, বেদগর্ভ সাবর্ণ-গোত্রজ এবং ছান্দড় বাৎস্য-গোত্রজ ছিলেন।

---

* আদিশূরের অন্য নাম বীরসেন বা শূরসেন, সেনবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া তাঁহাকে আদিশূর বলে। "সেন" রাজারা চন্দ্রবংশীয় এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত ও খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন এবং ভট্টনারায়ণ বেণী-সংহার নামক নাটক রচনা করেন। অপর তিন জনের লিখিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। পঞ্চ গোত্র হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ ঋষির বংশজাত, ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য ঋষির, দক্ষ কশ্যপ ঋষির এবং ছান্দড় বৎস্য ঋষির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গেশ্বর আদিশূর যজ্ঞ-সমাপনান্তে, উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে স্ত্রীপুত্রের সহিত ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ অংশে রাঢ়দেশে বাস করান। আদিশূর অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার রাজ্যলাভের সময়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সমস্ত বঙ্গদেশমধ্যে একজনও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এমত অবস্থায় প্রজাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তার ও বেদাদিশাস্ত্রের আলোচনার জন্য, আদিশূর এই পঞ্চ সুপণ্ডিত, বেদজ্ঞ; সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে গ্রাম ও স্থান দান করিয়া বঙ্গদেশে বাস করান। আদিশূরের রাজ্যে শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পঞ্চবিপ্র রাজার মত সম্মান ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে থাকেন। আদিশূর ইঁহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া গ্রাম প্রদান করেন এবং বিদ্যাপ্রচার ও গঙ্গাবাস জন্য, গঙ্গার উভয় তীরে যথেষ্ট স্থান প্রদান করেন। আদিশূর শ্রীহর্ষকে কঙ্কগ্রাম, ভট্টনারায়ণকে পঞ্চকোটি বা পঞ্চকোট, দক্ষকে কামকোটি, বেদগর্ভকে বটগ্রাম এবং ছান্দড়কে হরিকোটি গ্রাম বাসের জন্য দান করেন। এই সকল গ্রাম কোন্ জেলার অন্তর্গত, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে, কঙ্কগ্রাম—সিংহভূম, পঞ্চকোটি বা পঞ্চকোট—মানভূম, কামকোটি—বীরভূম, বটগ্রাম—বাঁকুড়া এবং হরিকোটি—বর্দ্ধমান, এই পাঁচটি জেলার অন্তর্গত।

উক্ত পঞ্চবিপ্রের ৫৬ জন সন্তান জন্মে। শ্রীহর্ষের ৪ সন্তান, ভট্টনারায়ণের ১৬ সন্তান, দক্ষেরও ১৬ সন্তান, বেদগর্ভের ১২ সন্তান এবং ছান্দড়ের ৮ সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত পঞ্চবিপ্র বঙ্গদেশে আসিবার পর এই সন্তানগুলি উৎপন্ন হইয়াছিল, কিম্বা কান্যকুব্জে অবস্থিতি কালে কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—তাহা নির্ণয় করা যায় না। দ্বিজপঞ্চক কান্যকুব্জ হইতে যখন বঙ্গে প্রথম আগমন করেন, তখন শ্রীহর্ষের বয়ঃক্রম ৯০ বর্ষ, ভট্টনারায়ণের ৭০, দক্ষের ৬০, বেদগর্ভের ৫০ এবং ছান্দড়ের ৩০ বর্ষ মাত্র ছিল। ছান্দড়ই তখন প্রকৃত যুবাপুরুষ ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ এবং শ্রীহর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সামবেদী ছিলেন এবং ইঁহাদের সন্তানপরম্পরা প্রায় সকলেই সাম-বেদের কৌথুমী শাখার অন্তর্গত মন্ত্রপাঠ দ্বারা অদ্যাপি সমস্ত বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। সামবেদের ত্রয়োদশ শাখার মধ্যে কৌথুমী শাখা—কাশী, কান্যকুব্জ, গুর্জ্জর ও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। রাণায়নী শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত আছে ও অন্যান্য একাদশটি শাখা এক্ষণে দেখা যায় না। প্রত্যেককে একখানি করিয়া, উক্ত পঞ্চ বিপ্রের ৫৬ সন্তানকে, রাজা আদিশূর ৫৬ খানি গ্রাম বাসের জন্য প্রদান করেন। ইঁহারা যে গ্রামে বাস করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে, ইঁহাদের বংশের উপাধি বা গাঁই হইয়াছে।

চৌধুরী-বংশের উৎপত্তি।

ভরদ্বাজ ঋষির বংশে শ্রীহর্ষ জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীহর্ষের চারি পুত্র। (১) ধাঙ্গু (সাধু), (২) নান, (৩) রূপ, (৪) রাম। শ্রীহর্ষের

চারি পুত্রের মধ্যে ধাঁছুর (সাধুর) মুখুটি গাঁই; নানের সাহরিক গাঁই; জনের ডিংসাই গাঁই; রামের রায়ী গাঁই (রায় গ্রামী)। ধাঁছু (সাধু) মুখোপাধ্যায়-বংশের আদিপুরুষ।

শ্রীহর্ষপুত্র জনের তিন পুত্র। * উক্ত তিনপুত্রের নাম,—(১) সত, (২) দিব্য, (৩) সিংহ। আগড়ডাঙ্গায় চৌধুরীবংশ সতর সন্তান। অর্থাৎ সতর যে বংশধরগণ আগড়ডাঙ্গায় বাস করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগকেই বঙ্গদেশের নবাব রায় চৌধুরী উপাধি দিয়াছিলেন। রায় চৌধুরীর পরিবর্ত্তে এক্ষণে লোকে চৌধুরী বলে।

সতর বংশধরগণ বহুকাল পর্য্যন্ত ডিংসাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ডিংসাই গ্রাম কোন্ জেলার অন্তর্গত, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে শুনিয়াছি যে, ঐ গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। সতর বংশধরগণের মধ্যে কে কোন্ সময় প্রথমে আগড়ডাঙ্গা গ্রামে আসিয়া বাস করেন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা যায় না। তবে সন ৯৭৪ সালে অর্থাৎ ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে চৌধুরী-বংশীয়গণ আগড়ডাঙ্গায় বাস করিতেছিলেন,—এ কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আগড়ডাঙ্গায় চৌধুরীদের ডিংসাই গাঁই এবং ইহারা সতর সন্তান। ইঁহারা ব্রাহ্মণের মধ্যে সিদ্ধ শ্রোত্রীয়। † সিদ্ধ শ্রোত্রীয় কাহাকে বলে? আদিশূর-আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের ৫৬টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আদিশূর তাঁহাদিগকে ৫৬ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। আদিশূরের ১৫৫ বৎসর পরে বল্লালসেন বাঙ্গালাদেশের রাজা হন। ঢাকার নিকটে আদিশূরের রাজধানী ছিল। বল্লালসেন সুবর্ণগ্রাম, গৌড় এবং নবদ্বীপ—এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ৫৬ জন ব্রাহ্মণ হইতে ১৫৫

---

* কেহ কেহ বলেন জনের চারি পুত্র—১। সত, ২। অন, ৩। দিব্য, ৪। সিংহ।

† শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচন্দ্র মজুমদার প্রণীত—"গৌড়ে ব্রাহ্মণ"—১৭৬ পৃষ্ঠা।

বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ বল্লালসেনের সময় একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। বল্লালসেন এই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে গুণানুসারে কুলীন, সিদ্ধ-শ্রোত্রীয়, সাধ্য শ্রোত্রীয় এবং কষ্ট শ্রোত্রীয়—এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। কুলীনের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সিদ্ধ শ্রোত্রীয়ের সম্মান কুলীন অপেক্ষা অল্প, কিন্তু সাধ্য শ্রোত্রীয় ও কষ্ট শ্রোত্রীয় অপেক্ষা অধিক। সাধ্য শ্রোত্রীয় কষ্ট শ্রোত্রীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রীয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কষ্ট শ্রোত্রীয় সকল অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

ডিংসাই-গ্রামী আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশ চিরকাল কুলীনে কন্যাদান করিয়া আসিতেছেন, কন্যাদান করিবার সময় জামাতা ও কন্যাকে ইঁহারা ভূমিদান করিয়া থাকেন।*

নদীয়া জেলার অন্তর্গত গাঙ্গুরিয়া গ্রামনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ডিংসাই-গ্রামী সিদ্ধ শ্রোত্রীয়। ইনি ৺গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশের সন্তান। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় স্মৃতি, ন্যায়, মীমাংসা, দর্শনাদি নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর পত্নী মহাদেবী সহমৃতা হন। এই ডিংসাই-গ্রামী সিদ্ধ শ্রোত্রীয়দের মধ্যে অনেক দেশেই অনেক স্ত্রীলোক সহমৃতা হইয়াছিলেন। আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশের গোকুলচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা অর্থাৎ বৃন্দাবনচন্দ্র চৌধুরীর সহোদরা রুক্মিণী দেবী সহমৃতা হইয়াছিলেন। † উক্ত গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়দের বংশের অন্য এক শাখা সিমহাট গ্রামে বাস করিতেছেন। ভবানীচরণ বিদ্যালঙ্কার গাঙ্গুরিয়া হইতে সিমহাটে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বাস করেন। এই বংশে অনেক বড় বড় পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য তর্করত্ন, দয়ারাম ন্যায়রত্ন, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, ভৈরব চন্দ্র ন্যায়ভূষণ, তারাচরণ সার্ব্বভৌম,

* শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ২য় সংস্করণ ব্রাহ্মণ-ইতিহাস, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

যদুনাথ ন্যায়ালঙ্কার, রমাপতি ন্যায়রত্ন, পূর্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ—এই কয়জন পণ্ডিতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁরা পাণ্ডিত্যে, কুলকর্ম্মে ও দানশীলতায় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশের তারাকুমার ন্যায়-পঞ্চানন বহুসংখ্যক ছাত্রকে বিদ্যা ও অন্নদান করিয়াছেন। তৎকালে এই স্থানটি ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। নদীয়াধিপতি, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য, পরমধার্ম্মিক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে এক সহস্র বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন।

ডিংসাই গ্রামী সতর বংশধরগণ কিছুকাল আগড়ডাঙ্গায় বাস করার পর মুসলমান-নরপতিগণের নিকট হইতে বিশেষ সম্মানসূচক রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। মৈমনসিং জেলার রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি বহুসংখ্যক বড় বড় জমিদার বংশ এবং বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানের প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমান জমিদার বংশ চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত। * সতর বংশধরগণের মধ্যে কে সর্ব্ব প্রথমে রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা যায় না। সতর বংশধর-গণ রায় চৌধুরী উপাধি পাইবার পর আগড়ডাঙ্গার আর একটি ব্রাহ্মণ-বংশ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকার হইতে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে আগড়ডাঙ্গার লোকে রায় চৌধুরীদিগকে রায় চৌধুরীর পরিবর্ত্তে কেবল চৌধুরী বলিয়া ডাকিত। গ্রামের লোকের দ্বারা এরূপ উপাধি পরি-বর্ত্তনের কারণ এই যে, "রায় চৌধুরীদের বাটী গিয়াছিলাম" বলিলে, কেবল "রায় চৌধুরীদের" বাটী গিয়াছিল, কি "রায়" ও "রায়চৌধুরী" উভয় বংশের বাটী গিয়াছিল,—ইহা অনেকে বুঝিতে পারিত না। সেই

---

* চৌধুরী—কোন গ্রামের বা ব্যবসায়ের প্রধান ব্যক্তি—সুবলচন্দ্র মিত্রের "সরল বাঙ্গালা অভিধান," ১২৭৩ পৃষ্ঠা।

জন্য লোকে বলিত, "রায়েদের বাড়ী গিয়াছিলাম," কিম্বা "চৌধুরীদের বাড়ী গিয়াছিলাম।" গ্রামের লোকের দ্বারা এইরূপে "রায় চৌধুরীদের" উপাধি কেবল "চৌধুরীতে" পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু দলিল প্রভৃতিতে ইঁহারা নামের পর রায় চৌধুরী লিখিতেন। বাল্যকালে আমি যখন আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী খাঁয়েরা গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম, সেই সময় কৌতূহল বশতঃ কয়েকটী পার্শি ভাষায় লিখিত অতি প্রাচীন দলিল, আমি উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পার্শিভাষাভিজ্ঞ পরম ধার্ম্মিক, নিঃস্বার্থ পরোপকারী, উদার মতাবলম্বী মৌলবী হসরৎ তুল্লা খাঁ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলাম। ঐ দলিলে নামের পর "রায় চৌধুরী" উপাধি দৃষ্ট হইয়াছিল। আমি আমার পূজনীয় পিতামহ ৺ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী মহাশয়কে ঐ সকল দলিলের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলাম এবং তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, আমাদের উপাধি "রায়চৌধুরী" এবং গ্রামে অন্য এক ব্রাহ্মণ বংশের রায় উপাধি থাকায়, আমাদিগকে লোকে "চৌধুরী" বলিয়া ডাকে এবং তাহাদিগকে "রায়" বলিয়া ডাকে। তিনি বলিয়াছিলেন যে লোকে আমাদিগকে চৌধুরী বলিয়া ডাকায়, আমরা দলিলে বহুদিন হইতে "রায় চৌধুরীর" পরিবর্ত্তে "চৌধুরী" লিখিয়া আসিতেছি। প্রাচীন দলিলে দেখা যায় যে নামের পর "শর্ম্মা চৌধুরী" লেখা আছে। আমার পিতামহকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে, শর্ম্মা ব্রাহ্মণদের উপাধি। ব্রাহ্মণগণ নামের পর শর্ম্মা উপাধি লিখিয়া থাকেন। নামের পর কেবল চৌধুরী লিখিলে কোন্ জাতি তাহা বুঝিতে পারা যায় না; সেইজন্য নামের পর "শর্ম্মা চৌধুরী" লিখিত হইয়া থাকে। যেমন ময়মনসিংএর রাজা সূর্য্যকান্ত নামের পর "আচার্য্য চৌধুরী" লিখিতেন, নদীয়া জেলার রাণাঘাটের জমিদারেরা নামের পর "পাল চৌধুরী" এবং বর্দ্ধমান জেলার

কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুরের জমিদারেরা নামের পর "নন্দি চৌধুরী" লিখিয়া থাকেন। আমাদের চৌধুরী উপাধি দেখিয়া অনেক স্থানে লোকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনারা কায়স্থ না সদ্‌গোপ?" কারণ তাঁহারা জানেন না যে, ব্রাহ্মণেরও "চৌধুরী" উপাধি আছে এবং ইহা নবাব-দত্ত বিশেষ সম্মানসূচক উপাধি।

চৌধুরী-বংশীয় আগড়ডাঙ্গার আদিম-নিবাসী।

চৌধুরী-বংশীয়গণ সর্ব্ব প্রথমে আগড়ডাঙ্গায় বাস করেন। তাঁহারা বাস করাতেই আগড়ডাঙ্গা গ্রামে পরিণত হয়। এই বংশটি সদাচার, দেবসেবা, অতিথি-সৎকার, পরোপকার, দানশীলতা এবং কুলক্রিয়ানুষ্ঠান-প্রবৃত্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত সদ্‌গুণ দেখিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুর, নাটোরাধিপতি রাজা রামজীবন এবং তাঁহার পুত্রবধূ অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী আগড়ডাঙ্গার চৌধুরী-বংশীয়গণকে বহুসংখ্যক ভূমি নিষ্কর দান করেন। আমার পিতামহ ৺ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর নিকট শুনিয়াছি যে, চৌধুরীদের ঠাকুরবাড়ী, ভদ্রাসন এবং আরও অনেক ভূসম্পত্তি কাহারও দান-বিক্রয়ের অধিকার নাই এবং উহা কাহারও ঋণ দায়ে বিক্রয় হইবে না। ঐ ঠাকুরবাড়ীতে চিরকাল দুর্গামণ্ডপ থাকিবে এবং বসিবার বৈঠকখানা ও পূজার ভাণ্ডার-ঘর থাকিবে। ভদ্রাসনে চৌধুরী-বংশীয়গণ দুর্গাদেবীর সেবাইৎরূপে বাস করিবেন এবং উল্লিখিত ভূসম্পত্তির আয় দুর্গাদেবীর ও তাঁহাদের শালগ্রামের পূজার খরচ স্বরূপ ব্যয়িত হইবে। চৌধুরী-বংশীয়েরা উপরোক্ত ঠাকুরবাড়ী, ভদ্রাসন এবং ভূসম্পত্তির "দেবোত্তর সম্পত্তি" নাম দিয়াছেন।

চৌধুরী-বংশীয়গণের দুর্গোৎসব।

চৌধুরীদের দুর্গার প্রতিমায় দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, মহিষাসুর, (মহিষ রহিত), সিংহ, সর্প, ময়ূর এই কয়েকটী মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। প্রতিমার চালে বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়া থাকে। প্রতিমা মৃত্তিকার অলঙ্কার, বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া থাকে। তবে কেহ ইচ্ছা করিলে, মালাকারের নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি দ্বারা প্রতিমা সাজাইতে পারেন।

দুর্গামণ্ডপ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত একটি উচ্চ দুচালা দক্ষিণদুয়ারি গৃহ। ৺আনন্দচন্দ্র চৌধুরী এই দুর্গামণ্ডপটীর চারিটী চাল প্রস্তুত করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব, এই কার্য্যটী করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

দুর্গাষষ্ঠীর দিবস হইতে চৌধুরীদের এবং আগড়ডাঙ্গার অন্যান্য ব্যক্তি-গণের দুর্গাপূজা আরম্ভ হইয়া থাকে। এই দিবস ষষ্ঠ্যাদিকল্প আরম্ভ এবং দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস হইয়া থাকে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তস্থ কালীপুকুর নামক পুষ্করিণীতে জল লইয়া, ষষ্ঠী ও সপ্তমী পূজার দিন ঘট পূর্ণ করা হইয়া থাকে। ইহাকে লোকে বলে,—"কালীপুকুরে ঘট আনিতে যাইতেছে।"

আগড়ডাঙ্গায় যে সকল বাটীতে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, সেই সকল বাটীর পুরোহিতগণ একত্রে সকল পূজা-বাটীর ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যসহ, কালীপুকুরে ঘট আনিতে গমন করেন।

চৌধুরীবাটীতে সপ্তমী পূজার দিন একটি, সন্ধিপূজায় একটি এবং নবমী পূজায় একটি ছাগ বলি হইবার নিয়ম। তবে সপ্তমী ও নবমী পূজায় একাধিক ছাগ বলিদান হইয়া থাকে। সন্ধিপূজায় বলির ছাগ

সম্পূর্ণ এক বর্ণের এবং কৃষ্ণ কিম্বা শ্বেতবর্ণের ও নির্দ্দোষ হওয়া প্রয়োজনীয়। সপ্তমী ও নবমী পূজার ছাগ নানাবর্ণের হইলেও ক্ষতি নাই, তবে নির্দ্দোষ হওয়া দরকার। ষষ্ঠী, মহা-অষ্টমী ও বিজয়া-দশমীতে ইঁহাদের বাটীতে বলিদান হয় না। বলিদানের সময় সমস্ত পূজাবাটির বাদ্যকরগণ, আপন আপন ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র লইয়া, সর্ব্ব প্রথমে চৌধুরীদের পূজাবাটিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ সময় অন্যান্য পূজা-বাটির ব্যক্তিগণও চৌধুরীদের পূজাবাটিতে আগমন করিয়া থাকেন। এইরূপে, সপ্তমী, সন্ধি এবং নবমী পূজায় সর্ব্ব প্রথমে চৌধুরীদের বাটিতে বলিদান হইয়া থাকে। চৌধুরীদের বাটিতে বলিদানের পর, ৺আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের বাটিতে বলিদান হয়। তারপর রায়দের বাটিতে বলিদান হয়। রায়দের বাটির বলিদানের পর চঁদদের (ইহারা গন্ধবণিক) বাটিতে বলিদান হয়। তৎপরে গ্রহাচার্য্যদের বাটিতে বলিদান হয়। গ্রহাচার্য্যদের বাটিতে বলিদানের পর কোটালবাটীতে বলিদান হইত। কিন্তু অবস্থা খারাপ হওয়ায়, কোটালেরা দুর্গোৎসব উঠাইয়া দিয়াছিল এবং এক্ষণে তাহাদের বংশধর যোগেন্দ্র কোটাল ও বিষ্ণুপদ কোটাল, আগড়ডাঙ্গার বাস ত্যাগ করিয়া, অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি যোগেন্দ্র কোটাল মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তিপুর থানার অন্তর্গত টেয়া—বৈদ্যপুরে বাস করিতেছে এবং বিষ্ণুপদ কোটাল বিবাহ করে নাই ও সন্ন্যাসীবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা "নবাবী-আমল" হইতে (অর্থাৎ মুসলমান নবাবদের সময় হইতে) আগড়ডাঙ্গায় চৌকিদার ছিল এবং তজ্জন্য তাহাদের অনেক চাকরান-জমি ও পুষ্করিণী ছিল। গ্রাম্যদেবী মঙ্গলচণ্ডী মাতার স্থানের পূর্ব্বদিকে এই কোটালদের বসতবাটি, ঠাকুর বাটি ও দুইটি পুষ্করিণী ছিল। ঐ সমস্ত সম্পত্তি "চাকরান" বিধায় গবর্ণমেণ্ট খাস করিয়াছেন এবং গ্রামের

পত্তনিদার ঐ সকল সম্পত্তি প্রজাবিলি করিয়াছেন। সেই জন্য কোটালেরা গ্রামের বাস ত্যাগ করিয়াছে।

চট্টোপাধ্যায়দের পূজাও উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ৺আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা-পত্নী এই পূজা চালাইতেছিলেন; কিন্তু এ বৎসর অর্থাৎ সন ১৩২৬ সালে তিনি প্রতিমা আনেন নাই, কেবল নবমী পূজার দিন ঘটস্থাপনা করিয়া দেবীর পূজা করিয়া, একটি কুষ্মাণ্ড বলিদান করিয়াছিলেন এবং ঐ দিন গ্রামের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহা বাঁড়ুযোদের বাটির পূজা বলিয়া কথিত হইত। কারণ এইটী বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটী এবং এই পূজা তাঁহাদের স্থাপিত। ৺আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়দের দৌহিত্র বংশোদ্ভব। ইহাঁদের পূজার বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে। সন্ধিপূজায় আগড়ডাঙ্গার দক্ষিণদিকস্থ যে কোন গ্রামের বাস্ত শুনিয়া প্রথমে চৌধুরীদের বাটীতে বলিদান হয়। বিজয়া দশমীর দিন প্রাতে আগড়ডাঙ্গার সিদ্ধান্ত উপাধিধারী গ্রহাচার্য্যগণ চৌধুরীবাটী গমন করিয়া তাঁহাদের দুর্গাদেবীকে আগামী বর্ষের পঞ্জিকা শুনাইয়া থাকেন। আগামী বৎসর কোন্ তারিখে দুর্গোৎসব হইবে এবং দেশের অবস্থা কিরূপ হইবে, কেবল তাহাই পাঠ করিয়া দেবীকে শুনাইয়া থাকেন।

পঞ্জিকা-পাঠের পর পুরোহিতগণ দেবীর পূজা ও মন্ত্র দ্বারা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন।

দেবীপুরাণান্তর্গত দুর্গাপূজাপদ্ধতি অনুসারে চৌধুরীদের বাটীতে দুর্গা-পূজা হইয়া থাকে।

চৌধুরীদের দুর্গাপূজার পুরোহিত সম্বন্ধে অর্থাৎ তন্ত্রধারক ও পূজক সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। কুলপুরোহিত সমর্থ হইলে তন্ত্রধারক কিম্বা পূজকের কার্য্য করিতে পারেন। তিনি অসমর্থ

হইলে বা অনিচ্ছুক হইলে কিম্বা অধিক পারিশ্রমিক চাহিলে কিম্বা তাঁহার সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য হইলে অন্য তন্ত্রধারক বা পূজক নিযুক্ত করিতে পারেন। চৌধুরীদের মধ্যে কেহ উপযুক্ত হইলে তিনিও তন্ত্রধারক বা পূজকের কার্য্য করিতে পারেন। ইঁহাদের পূজায় চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা নাই; তবে আমি কখন কখন দুই এক অধ্যায় পাঠ করিয়া থাকি। আমি উপদেশ দিতেছি যে, যদি আমার বংশের মধ্যে কেহ উপযুক্ত হয়, সে যেন দুর্গোৎসবের সময় আমাদের দুর্গাদেবীকে যথাসাধ্য মার্কণ্ডের চণ্ডী শ্রবণ করায়।

বিজয়া-দশমীর দিবস অপরাহ্নে চৌধুরীদের দুর্গাপ্রতিমা দুর্গামণ্ডপ হইতে বাহির করিয়া ঠাকুরবাটীর উঠানে উত্তরমুখে কিছুক্ষণ রাখা হয়। সেই সময় কোন পুরুষ ঠাকুরবাটীতে থাকিতে পায় না। পুরুষগণকে ঠাকুরবাটী হইতে সেই সময়ে বাহির করিয়া ঠাকুরবাটীর বহির্দ্বার বন্ধ করা হয়। তাহার পর স্ত্রীলোকেরা ঠাকুরবাটীতে আগমন করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। মঙ্গলাচরণ শেষ হইলে, স্ত্রীলোকেরা ভিতর বাটীতে গমন করেন; তৎপরে ঠাকুরবাটীর বহির্দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দেবীপ্রতিমা ঠাকুরবাটীর বাহিরে আনয়ন করা হয়। সেই সময় চৌধুরীদের প্রতিবেশীগণ ও প্রতিমাবাহকেরা দেবীপ্রতিমা তিনখণ্ড শক্ত, মোটা এবং লম্বা বাঁশের উপর স্থাপন করিয়া, শক্ত এবং মোটা রজ্জুদ্বারা উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া থাকে এবং প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ কম্বল দ্বারা ঢাকিয়া দেয়। এই সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে, বাগ্দিজাতীয় বাহকগণ অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া, রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত এই প্রতিমা, গ্রামের অন্যান্য লোকের প্রতিমার সহিত নাচাইয়া, শেষে গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তস্থ কালীপুকুর নামক পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করিত। কালীপুকুরের পাহাড়ে গ্রামের পত্তনি-তালুকদার বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম

থানার অন্তর্গত বেরুগ্রামের বা বেরগাঁয়ের মুন্সী সাজেদার রহমান সাহেব জমি প্রস্তুত করায় এবং প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে লইয়া যাইবার রাস্তা বন্ধ করায় আনুমানিক সন ১৩১০ সাল হইতে প্রতিমা গ্রামের দক্ষিণ-প্রান্তস্থ রায়েদের বড়পুকুর নামক পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করা হইয়া থাকে এবং সেই বৎসর হইতে ষষ্ঠী ও সপ্তমী পূজার দিবস ঘটও রায়েদের বড় পুষ্করিণীতে পূর্ণ করা হইয়া থাকে। এক্ষণে বাগ্দিজাতীয় বাহকেরা চৌধুরীদের প্রতিমা বহন করিয়া থাকে, কিন্তু ৺আনন্দমোহন চৌধুরী মহাশয়ের জীবিতাবস্থায়, আগড়ভাঙ্গা গ্রামের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত নূতন-পাড়া নামক স্থানের চালুতি সাউ বা সাহাগণ ঐ প্রতিমা বহন করিত ; তাহারা পারিশ্রমিকস্বরূপ কিছুই গ্রহণ করিত না। ইহারা জাতিতে চালুতি সাহা এবং প্রকাশ করে যে মদ্য বিক্রয়কারী সাহাদের অপেক্ষা ইহারা জাতিতে উচ্চ। কৃষিকর্ম্ম, চাউল প্রস্তুত ও বিক্রয় এবং তরকারী বিক্রয় ইহাদের ব্যবসায়।

বিজয়া-দশমীর রাত্রিতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর, গ্রাম্যদেবী মঙ্গলচণ্ডীর স্থানে চৌধুরীদের একটি, গন্ধবণিক-জাতীয় চঁদদের একটি এবং চট্টোপাধ্যায়দের একটি কুষ্মাণ্ড বলি হইয়া থাকে। ঐ সময় মঙ্গল-চণ্ডীর স্থানে কেবল উপরোক্ত তিন বাটীর বাদ্যকরগণ, আপন আপন বাদ্য বাজাইয়া থাকে। প্রথমে চৌধুরীদের কুষ্মাণ্ড বলি হয়, তৎপরে চট্টোপাধ্যায়দের কুষ্মাণ্ড বলি হয় এবং শেষে চঁদদের কুষ্মাণ্ড বলি হইয়া থাকে। বিজয়া-দশমীর দিবসে, ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিয়া থাকেন এবং সেই সময় আপন আপন কুষ্মাণ্ড মঙ্গলচণ্ডী দেবীর নিকট উৎসর্গ করিয়া থাকেন এবং ঐ কুষ্মাণ্ড বাটী লইয়া গিয়া আপন আপন দুর্গাদেবীর মণ্ডপে রাখিয়া দিয়া থাকেন। রাত্রে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জনের পর ঐ কুষ্মাণ্ড এবং খড়্গ মঙ্গলচণ্ডীর স্থানে

হইয়া গিয়া, কর্ম্মকার দ্বারা বলিদান করাইয়া থাকেন। বলিদানের পর ছেদিত কুষ্মাণ্ডখণ্ডসকল কামার, বাদ্যকর এবং চৌকিদার ভাগ করিয়া লইয়া থাকে। কুষ্মাণ্ড বলিদানের সময় লণ্ঠন কিম্বা শনকাঠির আলোকেই কার্য্য হইয়া থাকে।

চৌধুরীদের দুর্গাপূজায় দুইটী ঢাক ও একটী কাঁশি বাদ্যের নিয়ম আছে। ইহা ব্যতীত মানস করিয়া, কোন কোন বৎসর আরও অধিক বাদ্যের আয়োজন করিলে কোন ক্ষতি নাই।

যদি কেহ কোন বৎসর মানস করেন, তাহা হইলে তিনি চৌধুরীদের দুর্গাদেবীর সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত ছাগবলি হইলেও, মেষ, মহিষ, কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু প্রভৃতি বলিদান করাইতে পারেন। তবে এ বিষয়ে চৌধুরী-বংশীয়দের অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজনীয়।

চৌধুরীদের এবং গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিগণের পূজাবাটীতে রাত্রিতে দুর্গা প্রতিমার সম্মুখে এবং বৈঠকখানা প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত চারিটী, ছয়টী কিম্বা আটটী মুখবিশিষ্ট প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইত। কোন প্রদীপ উচ্চ দীপগাছার উপর স্থাপন করা হইত, কোন কোনটি কড়ি, বরগা প্রভৃতিতে ঝোলাইয়া দেওয়া হইত। সমস্ত প্রদীপেই সরিষার তৈল ব্যবহার করা হইত। সন্ধিপূজার বলিদানের সময় পনের, ষোল জন ব্যক্তি হস্তে কতকগুলি করিয়া শন কিম্বা পাটকাঠি লইয়া জ্বালিয়া দিত এবং সেই আলোকে বলিদান হইত। এক্ষণে দুর্গাদেবীর মণ্ডপে এবং বৈঠকখানা প্রভৃতি স্থানে, কেরোসিন তৈলের নানা প্রকার আলোক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে সন্ধিপূজার বলিদানের সময়, প্রাচীন প্রথানুসারে শন কিম্বা পাটকাঠি জ্বালিয়া দুর্গাবাটির প্রাঙ্গণ আলোকিত করা হয়। উপরোক্ত কেরোসিন আলোক সত্ত্বেও দেবী-প্রতিমার সম্মুখে একটি সরিষা তৈলের প্রদীপ কিম্বা সমর্থ হইলে একটি

বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। সন্ধিপূজায় বলিদানের সময় একশটী ঘৃতপূর্ণ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র প্রদীপ, একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চতুষ্কোণ পীড়ির উপর স্থাপন করিয়া জ্বালিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে দীপমালা বলে। দিবসে সন্ধিপূজার বলিদান হইলেও এই দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হয়।

পূজার নৈবেদ্যের আতপতণ্ডুল, মিষ্টান্ন, ফলমূল প্রভৃতির এবং ভোগের আতপতণ্ডুল, তরকারি প্রভৃতির কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য খরচ করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধ্যাতীত খরচ এবং কৃপণতা উভয়ই নিষিদ্ধ। ষষ্ঠী, সপ্তমী, মহা-অষ্টমী, সন্ধিপূজা, নবমী-পূজা এবং বিজয়া-দশমীর পূজায় মোট তিন মণ আতপের নৈবেদ্য হইতে আমি দেখিয়াছি। ষষ্ঠী-পূজায়, সপ্তমী-পূজায় এবং নবমী-পূজায় আতপান্নের ভোগ হইয়া থাকে। মহা-অষ্টমী পূজায় আতপ এবং ভাজা ব্রীহি কলাইএর ডাইলের (ডা'লের) খেচরান্ন ভোগ হইয়া থাকে। এই খিচুড়িতে নির্দ্দোষ গব্য ঘৃত দিতে হয়। সন্ধিপূজায় রুটির ভোগ হয়। দশমীপূজায় রুটি এবং চিঁড়ার ভোগ হইয়া থাকে। কোন পূজাতেই লুচির ভোগের ব্যবস্থা নাই। যদি কেহ চৌধুরীদের দুর্গাপূজায়, কোন দিন লুচির ভোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বপ্রথানুসারে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকলের ভোগ দিয়া শেষে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে প্রস্তুত লুচির ভোগ দিতে পারেন।

সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী-পূজার দিন চৌধুরীদের বাটীতে আগড়-ডাঙ্গার সমস্ত ব্রাহ্মণগণের পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা এবং বিধবা নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। বিজয়া-দশমীর দিবসে এবং ষষ্ঠী-পূজার দিন চৌধুরীদের বাটীতে কাহারও নিমন্ত্রণ হয় না। কিন্তু বিজয়া-দশমীর রাত্রিতে চৌধুরীদের বাটীতে আগড়ডাঙ্গার সমস্ত ব্রাহ্মণ বালকবালিকা সহ

নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। সপ্তমী এবং নবমী-পূজার দিন আগড়ডাঙ্গার সমস্ত হিন্দু জাতির পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা এবং বিধবা চৌধুরীদের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। ষষ্ঠী, সপ্তমী, মহা-অষ্টমী, নবমী এবং বিজয়া-দশমীর দিবসে ও রাত্রিতে চৌধুরীদের প্রতিবেশীগণ তাঁহাদের বাটিতে আহার করেন, দিবসে স্নানের তৈল এবং জল খাবার মুড়ি ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত গ্রামের কিম্বা ভিন্ন গ্রামের হিন্দু, মুসলমান, নিমন্ত্রিত কি অনিমন্ত্রিত যে কেহ চৌধুরীবাটীতে পূজার দিনে আহার করিতে বসিবে, তাহাকেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হইয়া থাকে। গত কয়েক বৎসর হইতে চৌধুরীদের অনেক ভূসম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় এবং দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে সমস্ত খরচ সংকুলন না হওয়ায় উপরোক্ত কার্য্যগুলির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

চৌধুরীদের দেবোত্তর সম্পত্তির প্রজা মাখনচন্দ্র ঘোষ মহাষ্টমী এবং সন্ধিপূজায়, চৌধুরীদের পূজার ভাণ্ডারে কার্য্য করিয়া থাকে। সে ফলমূল কাটিয়া নৈবেদ্যের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করে। যাহাকে যাহা দেওয়া উচিত, সে পূজার ভাণ্ডার হইতে সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া, তাহাদিগকে দিয়া থাকে। বিজয়া-দশমীর রাত্রে প্রতিমাবাহক এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণকে পূজার ভাণ্ডার হইতে মুড়ি-মিষ্টান্নাদি দিয়া থাকে। মাখন ঘোষের পিতা ৺ দুর্গাচরণ ঘোষ এবং পিতামহ ৺ নফরচন্দ্র ঘোষ, তাহাদের জীবদ্দশায় এই কার্য্য করিত। মাখন ঘোষের পুত্র কানাই ঘোষ এবং মাখন ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ গোকুলচন্দ্র ঘোষের পুত্র ধর্ম্মদাস ঘোষ, মাখন ঘোষের নিকট এক্ষণে এই কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। মাখন ঘোষের পিতামহ ৺ নফরচন্দ্র ঘোষ আগড়ডাঙ্গা গ্রামে বাস করিয়াছিল। শুনিয়াছি ইহাদের পূর্ব্ববাস বর্দ্ধমান জেলার গলসি থানার অন্তর্গত মাড়ো গ্রামে ছিল। এই গ্রামে নিত্যানন্দ-বংশীয়

গোস্বামীদের বাসস্থান আছে। "রামরসায়ণ" প্রণেতা ৺ রঘুনন্দন গোস্বামী মাড়ো গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

৺ভোলানাথ নাপিতের পূর্ব্বপুরুষেরা চৌধুরীদের দুর্গোৎসবের সময় বিল্বপত্র, পুষ্প, মানকচুর পাতা এবং অশোকবৃক্ষের ডাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিত। পূজার নৈবেদ্য বিলি করিত এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় গ্রামবাসীদিগকে চৌধুরীদের পূজায় প্রসাদ খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিত। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যেও চৌধুরীদের বাটীতে ইহারা নাপিতের করণীয় সমস্ত কার্য্য করিত। ইহারা চৌধুরীদের ক্ষৌর-কর্ম্ম করিত। ইহা ব্যতীত নাপিতের করণীয় সমস্ত কার্য্য ইহারা সম্পন্ন করিত। এক্ষণে ভোলানাথ ভাণ্ডারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার ভ্রাতা রক্ষিত ভাণ্ডারী এই কার্য্য করিতেছে। এই কার্য্যের জন্য চৌধুরীদের ভূমি এবং বাটী ভোগ করিতেছে।

ফুরুহারিণীর পিতা, পিতামহ প্রভৃতি চৌধুরীদের বাটী, বহির্বাটী এবং পূজার সময় পুষ্করিণীতে যাইবার রাস্তা প্রভৃতি ঝাঁইট দিয়া এবং নিকাইয়া পরিষ্কার করিত। এক্ষণে ফুরুহারিণী মজুরী স্বরূপ চৌধুরীদের জমি ভোগ করিতেছে এবং ইহার পূর্ব্বপুরুষেরাও এই কার্য্যের জন্য জমি ভোগ করিত।

চৌধুরী-বংশীয়গণের নিত্যসেবা।

চৌধুরীদের শালগ্রাম শিলার নাম ৺রণরাম। দেবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরী এই শালগ্রাম স্থাপন করেন বলিয়া অনুমান হয়। এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, নাটোরের পুণ্যবান্ রাজা রামজীবন শালগ্রামের

(বিষ্ণুর) সেবার জন্য দেবকীনন্দন চৌধুরীকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, দেবকীনন্দন চৌধুরীর কোন জ্ঞাতি, কিম্বা তাঁহার জ্ঞাতিবংশজ কোন ব্যক্তি, ৺রণরাম বিষ্ণুর সেবা করেন নাই; অথচ দেবকীনন্দন চৌধুরীর বংশধরেরা সকলেই ৺রণরামদেবের সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ দেবোত্তর সম্পত্তিও ভোগ করিয়া আসিতেছেন। চৌধুরীদের বাটীতে একটী বহু প্রাচীন পূর্ব্বদ্বারী গৃহ ছিল। এই গৃহের মধ্যে একটী প্রাচীর থাকায় গৃহটী দুইটী গৃহে বিভক্ত হইয়াছিল। এই দুইটী ঘরের উত্তরদিকের ঘরে ৺রণরামদেব থাকিতেন। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী ও পরেশনাথ চৌধুরী পৃথক হইলে, এই পূর্ব্বদ্বারী গৃহটী ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর অংশে পড়িয়াছিল। সেই সময় এই দুই ভ্রাতায় ৺রণরামদেবের অবস্থিতির জন্য দক্ষিণ দুয়ারী বর্ত্তমান ঠাকুরঘরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৺রণরামদেবের পূজায় কোন আড়ম্বর নাই। পঞ্চোপচারে পূজা হইয়া থাকে। সামান্য গুড় কিম্বা মিষ্টান্ন দ্বারা দিবসে পূজা এবং সন্ধ্যার সময় 'শীতল' হয়, আতপান্ন কিম্বা ফলমূলের প্রয়োজন হয় না। পুষ্করিণীর জলে পূজা হইয়া থাকে; গঙ্গাজলের প্রয়োজন নাই। সামান্য ফুল এবং তুলসীপত্র দ্বারা পূজা হয়। সিদ্ধ চাউলের অন্নের ভোগ হইয়া থাকে; আতপান্নের প্রয়োজন নাই। কোন কারণে অন্নের ভোগ না হইলে, চিঁড়ার ভোগ দেওয়া হয়। যদি কেহ এই পূজায় অধিক খরচ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অগ্রে উপরোক্ত দ্রব্য সকল দ্বারা পূজা করিয়া এবং ভোগ দিয়া, পরে অন্যান্য দ্রব্যের দ্বারা পূজা ও ভোগ দিতে পারেন।

চৌধুরী-বংশীয়গণের গুরু-গৃহ।

চৌধুরীদের গুরু-গৃহ বর্দ্ধমান জেলার কাটয়া থানার অন্তর্গত বেঙ্গাগ্রামে ছিল। এই গ্রাম কাটয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং দাঁইহাটের দুই ক্রোশ দক্ষিণ। ইঁহাদের গুরুবংশীয়গণ মুখ্য (স্বভাব) কুলীন ছিলেন। তাঁহারা শাক্ত হইলেও মদ্যপায়ী ছিলেন না। তাঁহারা বৈদিক, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক মতে তাঁহাদের নিজের দশকর্ম্ম এবং দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি ক্রিয়া করিতেন এবং করাইতেন। তাঁহাদের শিষ্যেরাও গুরুদেবগণের ন্যায় সকল ক্রিয়াতেই উপরোক্ত প্রণালী অনুসরণ করিতেন। চৌধুরীদের বেঙ্গাগ্রামস্থ শেষ গুরুদেবের নাম ৺দুর্গাগতি চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীকালীপদ চৌধুরী সর্ব্ব প্রথমে অন্য বংশীয় গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি বর্দ্ধমান জেলার সাতগাছিয়া (সাতগেছে) থানার অন্তর্গত বণ্ডুল গ্রামনিবাসী শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। উক্ত গুরুদেবের গুরুদত্ত নাম পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামী। বর্দ্ধমানে রেলষ্টেসনের, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রাস্তার এবং মিউনিসিপাল আফিসের নিকটে উক্ত গুরুদেবের "বিশুদ্ধাশ্রম" নামক একটী আশ্রম আছে। তথায় শিষ্যগণকে তিনি যোগশিক্ষা দিয়া থাকেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম্মানুগত মন্ত্রই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি যোগজ্যোতিষ জানেন এবং যোগসম্বন্ধীয় অনেক অলৌকিক কার্য্য দেখাইতে পারেন। ইঁহার বহুসংখ্যক শিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী শিষ্য আছেন। কালীপদ চৌধুরীর পত্নী কালীপদ চৌধুরীর আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের পুরোহিত স্বগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর নিকট (শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মাতার

নিকট) সন ১৩২৫ সালের ৪ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার আগড়ডাঙ্গা গ্রামে মন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। কালীপদ চৌধুরীর আজ্ঞা এই যে, চৌধুরীবংশে বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা এখন হইতে যেন নারীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা কদাচ যেন কোন পুরুষের নিকট মন্ত্রগ্রহণ না করেন। চৌধুরীবংশীয় কন্যাগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাদের স্ব স্ব স্বামীর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবেন। পুরুষ সম্বন্ধে কালীপদ চৌধুরীর আজ্ঞা এই যে, চৌধুরীবংশীয় কোন পুরুষ কদাচ কোন স্ত্রীলোকের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। কালীপদ চৌধুরী ভারতের নানাস্থানে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে বহু পণ্ডিত ও মূর্খ গুরুর বীভৎস কার্য্য-কলাপ দর্শনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা হইতেই তিনি গুরু নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার বংশধরগণকে এই উপদেশ দিলেন। চৌধুরীবংশীয় কোন ব্যক্তি, যদি কোন গুরুবিশেষের অসাধারণ পাণ্ডিত্য বা অলৌকিক যোগবল দেখিয়া, কালীপদ চৌধুরী-প্রদত্ত গুরু-নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় উপদেশ সকলের অন্যথাচরণ করেন, তাহা হইলে অনেক সময়ে যে তাঁহাকে কুফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কালীপদ চৌধুরীর আরও একটী উপদেশ এই যে, কিছুদিন ধরিয়া গোপনে গুরুর চরিত্র এবং পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিয়া, যদি তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়, তবে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবে ; কিন্তু গুরুবংশীয় কাহারও কোন দোষ দেখিলে তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। এরূপ স্থলে, পরীক্ষা দ্বারা অন্যবংশীয় কাহারও উপর ভক্তি হইলে, তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে এবং শক্তিমন্ত্রে-দীক্ষিত হইবে।

চৌধুরী বংশীয়গণের কুল-পুরোহিত।

আগড়ডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা চৌধুরীদের পুরোহিত ছিলেন। ইঁহারা স্মৃতি, দশকর্ম্ম এবং কাব্যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই বংশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এক্ষণে কেবল ৺শিবরাম ভট্টাচার্য্য, ৺রামনাথ বিদ্যাবাগীশ এবং ৺পরীক্ষিৎ ভট্টাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। শেষে এই বংশীয় বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি তাঁহার কন্যা যাদুমণি দেবীর স্বামী ৺রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার বাটীতে আগড়ডাঙ্গায় বাস করান। চৌধুরীদের বর্ত্তমান পুরোহিত শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৺রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। ইঁহারা শাক্ত। চৌধুরীরা চিরকাল তাঁহাদের পুরোহিতবংশীয়-গণের যথেষ্ট সম্মান করিয়া আসিতেছেন। চৌধুরীবংশীয়গণ ইঁহাদিগকে এতদূর সম্মান করেন যে, তাঁহারা কেহ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের কাহারও স্পৃষ্ট জলে হস্তমুখ পর্য্যন্ত প্রক্ষালন করেন না।

চৌধুরী-বংশীয় বালকবালিকাগণের শৈশবে অন্নপ্রাশন সম্বন্ধীয় কোন শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া হয় না। একটী শুভদিন স্থির করিয়া, বালকের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং বালিকার পঞ্চম বা সপ্তম মাসে মুখে, চৌধুরীদের কুল-দেবতা ৺রণরাম-শালগ্রামের, কুলদেবীর এবং বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত খাঁরুলগ্রামের ডুলেবাগদিবাটীস্থ ৺কালীমাতার প্রসাদ দেওয়া হয়। এই খাঁরুলগ্রাম বাণ্ডেল—বারহারয়া রেললাইনের গঙ্গাটিকুরী রেলষ্টেসনের নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিত। গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র। এই গ্রামের নিকটে বনঘারি-আবাদ এবং গঙ্গাটিকুরী নামক দুইটী ভদ্রপল্লী আছে। খাঁরুল গ্রামে একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে ৺কালীমাতার মৃত্তিকানির্ম্মিত মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে কয়েকটী মৃন্ময় কালীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত

আছেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ বৃক্ষতলে কতিপয় নরমুণ্ড অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। স্থানটী অতি মনোরম। এইস্থানে উপস্থিত হইলে স্বভাবতঃই ভক্তির উদ্রেক হয়। এই গ্রামের ডুলেবাগ্দিগণ আনুমানিক ৬০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত কালীপ্রতিমা কয়েকটী স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের বংশধরেরা পূর্ব্বপ্রথানুসারে স্বয়ং এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে। পূজার জন্য ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হয় না। প্রতি মঙ্গল এবং শনিবারে এইস্থানে নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়। কেহ সন্তান কামনায়, কেহ কোন কঠিন ব্যাধিমুক্তি কামনায় এবং কেহ অভীষ্টসিদ্ধি মানসে এইস্থানে আগমন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক কালীপদ চৌধুরীর জন্মের পূর্ব্বে এই বংশীয় সন্তানগণের অন্নপ্রাশনের সময় শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্য হইত। কালীপদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অন্নপ্রাশন দিবসে ব্রাহ্মণভোজনাদির পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময় হইতে আট বৎসরের মধ্যে কালীপদ চৌধুরীর মাতার কোন সন্তান জন্মে নাই। কালীপদ চৌধুরীর মাতা থাঁকুলের ৺কালীর নিকট পুত্র কামনা করিয়াছিলেন এবং ইহার পর কালীপদ চৌধুরী ভূমিষ্ঠ হন। ৺কালীর নিকট পুত্র কামনা করায় পুত্র জন্মিয়াছিল বলিয়া এই পুত্রের কালীপদ নামকরণ হইয়াছেন এবং অন্নপ্রাশন দিবসে কালীপদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া শৈশবে কালীপদ চৌধুরীর অন্নপ্রাশন হয় নাই, কেবল থাঁকুলের ৺কালীর এবং চৌধুরীদের কুলদেবতা ৺রণরাম-শালগ্রামের এবং কুলদেবী ৺দুর্গার প্রসাদ তাঁহার মুখে অন্নপ্রাশন দিবসে প্রদত্ত হইয়াছিল। উপনয়নের সময় কালীপদ চৌধুরীর অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ এবং উপনয়নের শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি কার্য্য হইয়াছিল। সেই

সময় হইতে চৌধুরীবংশীয় পুত্রগণের অন্নপ্রাশন উল্লিখিত প্রথামত হইয়া থাকে এবং কন্যাগণের মুখে, অন্নপ্রাশনের পরিবর্তে, উপরোক্ত প্রসাদ প্রদত্ত হয় এবং তাহাদের বিবাহের সময় অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে।

বিদ্যারম্ভ।

চারি বৎসর, চারি মাস, চারিদিন বয়সে, কিম্বা তাহার কিছু পূর্ব্বে বা পরে, একটি শুভদিনে চৌধুরীবংশীয় বালকগণের বিদ্যারম্ভক্রিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সম্পাদিত হয়।

উপনয়ন।

উপনয়ন-সংস্কারের সময় চৌধুরীবংশীয় বালকগণের অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য খরচ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু যজ্ঞোপবীতের খরচের নিমিত্ত অর্থ বা কোনদ্রব্য ঋণস্বরূপ গ্রহণ করা নিষেধ। এই অনুষ্ঠানে এরূপ মিতব্যয়ী হইতে হইবে যে, যেন এই উৎসবের ফলে, সে বৎসরের কোন সময়ে ঋণগ্রহণ করিতে না হয়।

বিবাহ।

পূর্ব্বে চৌধুরীবংশীয় বালকগণের বিবাহের বয়স ও খরচ সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না। এই গ্রন্থের লেখক কালীপদ চৌধুরী নিয়ম করিলেন যে, এই বংশীয় কোন বালক-বালিকার বাল্যবিবাহ হইতে পারিবে না; বিবাহের খরচসম্বন্ধে যথেষ্ট মিতব্যয়ী হইতে হইবে, অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত

বিবাহে ঋণগ্রহণ করিতে পাইবে না, অপরিহার্য্য কারণ ভিন্ন অর্থব্যয় করিয়া বিবাহে বাদ্য, নৃত্য, গীত, অগ্নিক্রীড়া প্রভৃতি করিতে পাইবে না। বিবাহ সময়, চৌধুরীবংশীয় কন্যাগণের অন্নপ্রাশন ক্রিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সম্পাদিত হয়, কারণ বাল্যকালে এই বংশীয় বালকবালিকাদের অন্নপ্রশান ক্রিয়া কৃত হয় না। আশা করি কালীপদ চৌধুরীর বংশধরগণ এবং তাঁহার আত্মীয়গণ এই নিয়মগুলির অবহেলা করিবে না।

শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধে চৌধুরী-বংশীয়গণ সাধ্যানুসারে ব্যয় করিয়া থাকেন। ইঁহারা কখন "দানসাগর" শ্রাদ্ধ করেন, সপ্তগ্রামী ব্রাহ্মণ এবং বহুসংখ্যক শূদ্র ও কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া থাকেন এবং বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে রীতিমত দান করিয়া থাকেন; আবার কখন অতি সামান্য ব্যয়ে শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করেন। এই বংশের নিয়ম এই যে, যাহার যেমন সাধ্য সে শ্রাদ্ধে তেমনি খরচ করিবে।

অতিথিশালা।

অতিথিশালা চৌধুরীদের একটী প্রধান কীর্ত্তি ছিল। পূর্ব্বে রেলরাস্তা না থাকায়, সন্ন্যাসীগণ এবং তীর্থযাত্রিগণ পদব্রজে তীর্থযাত্রা করিতেন। পথশ্রান্ত সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রিগণের বিশ্রামের নিমিত্ত সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অতিথিশালা স্থাপন করিতেন। উল্লিখিত সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রিগণ উক্ত অতিথিশালায় দুই এক দিবস বিশ্রাম করিতেন। তাঁহাদের খাদ্যাদির ব্যয়ভার অতিথিশালা সংস্থাপকেরা এবং তাঁহাদের পরলোক গমনের পর, তাঁহাদের বংশধরগণ বহন করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে

দেবতা-প্রতিষ্ঠার ন্যায় অতিথিশালা সংস্থাপন একটি পুণ্যকার্য্য। চৌধুরী-দের ঠাকুর বাটীর পূর্ব্বদ্বারী বহির্দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী উচ্চ গৃহ ছিল; উহা অতিথিগণের খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতির ভাণ্ডাররূপে ব্যবহৃত হইত, দরজায় অতিথিগণ রন্ধন ভোজন করিতেন এবং ঠাকুরবাটির বৈঠকখানা প্রভৃতিতে তাঁহারা বিশ্রাম করিতেন। এই সমস্ত অতিথিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই রাজপুতনা, পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশবাসী। বঙ্গদেশীয় অতিথি কখন কখন দুই একজন আগমন করিতেন। মধ্যে মধ্যে দুই একজন বা ততোধিক পঞ্চতপা সন্ন্যাসী আগমন করিতেন। তাঁহারা বৈশাখ মাসের রৌদ্রে বসিয়া আসনের চারিদিকে চারিটী অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। কখন কখন দুই একজন সন্ন্যাসী হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, কিম্বা শিবিকারোহণে আগমন করিতেন। চৌধুরী-বংশীয়গণ এই সমস্ত অতিথিগণের অবস্থিতির ব্যয়ভার বহন করিতেন। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী ও পরেশনাথ চৌধুরী দুই ভ্রাতায় পৃথক হইবার পর, পরেশনাথ চৌধুরীর মৃত্যু হয়। পরেশনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর, তাঁহার কন্যা গোলাপসুন্দরী দেবী পরেশনাথ চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হন। গোলাপসুন্দরী দেবীর বর্দ্ধমান জেলার কাটয়া থানার অন্তর্গত দাঁইহাট গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। তিনি সকল সময়েই স্বামী-গৃহে দাঁইহাট গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। তিনি অতিথিশালার ব্যয়ের অংশ প্রদান করিতেন না। তথাপি ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী, চৌধুরীদের কেবল অর্দ্ধেক সম্পত্তির মালিক হইয়াও, প্রায় এগার বৎসর অতিথিশালার সমস্ত ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বপুরুষগণের বার্ষিক শ্রাদ্ধ এবং ভদ্রলোকাদির গতিবিধির এবং তদ্রূপ আরও অনেক কার্য্যের সমস্ত ব্যয়ভার কেবল ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীকেই বহন করিতে হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পুণ্যবান ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী ঋণগ্রস্ত হইয়া

পড়িলেন। তখন মা লক্ষ্মী তাঁহাকে বলিলেন "বৎস! আমাকে ত্যাগ কর, না হয় বনিয়াদি চা'ল ত্যাগ কর।" ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী বুনাদিচা'লের মধ্যে অতিথিশালাটী অতি কষ্টে ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তিনি সমস্ত বুনাদিচা'ল ছাড়িতে পারিলেন না। আজ্ঞা অবহেলাহেতু লক্ষ্মীদেবী বিরক্ত হইয়া শেষে ক্রমে ক্রমে চৌধুরী-গৃহ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর দুই বৎসরের পর মা লক্ষ্মী চৌধুরী গৃহ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু যাইবার সময় একদিন গম্ভীর রাত্রে, স্বপ্নে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর পৌত্র কালীপদ চৌধুরীকে মা লক্ষ্মী কহিলেন,—"বৎস! হতাশ হইবে না, আমি তোমাদের অতিথি সৎকারের গৃহ অতিকষ্টে পরিত্যাগ করিতেছি, আবার এই গৃহে শীঘ্র আসিব, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, আমি তোমাদের গৃহ পরিত্যাগ করাতে তুমি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিবে, আমি কাহারও গৃহে থাকিলে সে এরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। বৎস! যাইবার সময় তোমাকে আর একটী কথা বলিয়া যাইতেছি,— "যে সকল ব্যক্তি তোমাদের বহুপ্রাচীন ধর্ম্মের গৃহটী নষ্ট করিল, তাদের সর্ব্বনাশ শীঘ্রই হইবে।"

বৈঠকখানা।

চৌধুরীদের ঠাকুরবাটীর দক্ষিণ প্রান্তস্থ বৈঠকখানা সন ১১৬০ সালে আনন্দ চন্দ্র চৌধুরী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই বৈঠকখানার পূর্ব্বপার্শ্বে একটী ও পশ্চিমপার্শ্বে একটী গৃহ আছে এবং উভয় গৃহের মধ্যস্থলে বারান্দা। এই বৈঠকখানার বারান্দা হইতে দুর্গাপ্রতিমা অতি সুন্দররূপে দৃষ্ট হয়। দুর্গোৎসব ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম্মে এই বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। এতদ্ভিন্ন সচরাচর ইহা বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়।

ঠাকুরবাটী।

ঠাকুরবাটীর পশ্চিম প্রান্তে একটী অতি প্রাচীন গৃহ ছিল। ত্রৈলোক্য নাথ চৌধুরীর সময় সেই গৃহটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সন ১২৯৫ সালে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী সেই স্থানে পুনরায় একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই গৃহটী সন ১৩২৩ সালে ঝটিকায় ভূমিসাৎ হইয়াছিল। সন ১৩২৬ সালের বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের লেখক কালীপদ চৌধুরী পুনরায় সেই স্থানে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই গৃহটী সন ১৩২৫ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং সন ১৩২৬ সালের বৈশাখ মাসে নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল, কেবল কপাট ও জানালা তৈয়ার হয় নাই। মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানায় কালীপদ চৌধুরী তখন কার্য্য করিতেন। এই গৃহটী নির্ম্মাণের সময় একবারও তিনি বাটী আসিতে পান নাই। তাঁহার ভগিনীপতি মুর্শিদাবাদ জেলার কাগ্রাম থানার অন্তর্গত মালিহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার পুরোহিত স্বগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই গৃহটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গৃহটীর পূর্ব্বদিকের বারান্দায় দুর্গোৎসবের সময় ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়া থাকে।

ঠাকুরবাটীর পূর্ব্ব প্রান্তস্থ সদর দরজা সন ১৩২৩ সালে ভগ্ন হইয়াছিল। সন ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে কালীপদ চৌধুরী এই দরজা পুনরায় তৈয়ার করাইয়াছেন। দুর্গোৎসবের সময় এই দরজায় বসিয়া বাদ্যকরগণ বাদ্য করিয়া থাকে।

ঠাকুরবাটীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থ গুলুঞ্চ বৃক্ষ ত্রৈলোক্যনাথ

চৌধুরীর মাতুল আগড়ডাঙ্গা নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আনুমানিক সন ১২৪৬ সালে রোপণ করিয়াছিলেন। অনেক সময় এই বৃক্ষের অনেক শাখা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। এই বৃক্ষে সকল সময়েই পুষ্প থাকে; তবে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে ৺রণরামদেবের পূজার নিমিত্ত অধিক পুষ্প প্রয়োজন হইয়া থাকে; এই গুলুঞ্চ বৃক্ষই সে প্রয়োজন সম্পাদিত করিয়া থাকে।

ঠাকুরবাটীর মধ্যে পূর্ব্বদিকে দুর্গামণ্ডপের নিকটে একটী বিল্ববৃক্ষ ছিল। এই বৃক্ষটী আনুমানিক সন ১৩২০ সালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সেই স্থানে কালীপদ চৌধুরী সন ১৩২৬ সালে পুনরায় একটী বিল্ববৃক্ষ রোপণ করাইয়াছেন। দুর্গোৎসবের সময় বিল্ববৃক্ষের প্রয়োজন হইয়া থাকে।



আগড়ডাঙ্গার চৌধুরী-বংশের ইতিহাস।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা আপনার দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ এবং অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সেই নারীর গর্ভে বিরাট্‌কে উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মনু তপস্যা করিয়া মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ—এই দশজন মহর্ষিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজের পুত্র অপ্রতিরথ। অপ্রতি-

সুখের পুত্র কণ্ব। কণ্বের পুত্র ধীর। ধীরের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ।

৯৯৯ সংবতে অর্থাৎ ৯৪২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপ আদিশূর পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থে কান্যকুব্জ হইতে ভরদ্বাজ-গোত্রজ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গাধিপতি আদিশূরের যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে পরম যত্নের সহিত বঙ্গদেশে বাস করান। মহারাজ আদিশূর মহর্ষি শ্রীহর্ষকে সিংহভূম জেলার অন্তর্গত কঙ্কগ্রাম বাসের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাবাস ও চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য গঙ্গার উভয় তীরে যথেষ্ট ভূমি দান করিয়াছিলেন।

মহর্ষি শ্রীহর্ষের চারিটী পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম—(১) ধাতু বা সাধু, (২) নান (লাল), (৩) জন (জনার্দ্দন) এবং (৪) রাম।

মহারাজ আদিশূর শ্রীহর্ষের পুত্র জনকে (জনার্দ্দনকে) বেদ প্রচার ও বাসস্থানের নিমিত্ত ডিংসাই (ডিণ্ডিসাহী) গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। ডিংসাই (ডিণ্ডিসাহী) গ্রামের নামানুসারে জনের (জনার্দ্দনের) পরবর্ত্তী বংশধরগণের ডিংসাই গাঁই হইয়াছে।

জনের বংশে পরবর্ত্তীকালে সত, জন, দিব্য, সিংহ—এই চারি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। এই চারি ভ্রাতার পিতার নাম নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। এই চারি ভ্রাতা সিদ্ধ শ্রোত্রীয় ছিলেন। কথিত আছে যে, দেবীবর ঘটক গৌণ কুলীনগণকে শ্রোত্রীয়ান্তর্গত করিয়া সমস্ত গৌণ কুলীন ও শ্রোত্রীয়গণকে চারিটী শ্রোত্রীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই চারিটী শ্রোত্রীয় শ্রেণীর নাম:—১। সুসিদ্ধ শ্রোত্রীয়, ২। সিদ্ধ-শ্রোত্রীয়, ৩। সাধ্য শ্রোত্রীয় এবং ৪। অরি শ্রোত্রীয়। মুখ্য কুলীনগণ সুসিদ্ধ, সিদ্ধ এবং সাধ্য শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু অরি শ্রোত্রীয়ের কন্যা বিবাহ করিলে, তাঁহাদের কুল ভঙ্গ হইবে। দেবীবর

ঘটক ডিংসাই (ডিণ্ডিসাহী) গাঁইএর সত্ত, জন, দিবা এবং সিংহ—এই চারি ভ্রাতাকে সিদ্ধ শ্রোত্রীয়ান্তর্গত করিয়াছিলেন। গৌড়ের স্বাধীন পাঠান ভূপতিদিগের রাজত্ব-কালে শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেবীবর ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। অতএব সত্ত, জন, দিব্য এবং সিংহ—এই চারি ভ্রাতাও শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি সংগ্রহ করেন, চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি (কাণাভট্ট শিরোমণি) মিথিলাতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং মিথিলার প্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত করিয়া ন্যায়-শাস্ত্রের দীধিতি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দৈবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরী।

সত্তর বংশে দৈবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। ইনি সন ১১০৮ সালে জীবিত ছিলেন। সন ১১০৮ সালে কিম্বা ১১১৩ সালে নাটোরের রাজা রামজীবন দৈবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরীকে কিছু নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। রাজা রামজীবন প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর শ্বশুর ছিলেন। অনুমিত হয় যে, সন ১০৫০ সালের দুই এক বৎসর পূর্ব্বে কিম্বা দুই এক বৎসর পরে দৈবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার কোন পূর্ব্ব পুরুষ রণরাম নামক শালগ্রাম-শীলা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং রণরাম ইঁহার অংশে পড়িয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনিই রণরাম দেবকে স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু পূর্ব্বে ইঁহার কোন পূর্ব্ব পুরুষ দুর্গোৎ-সব আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার

নবাবের রাজধানী ঢাকা হইতে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ইঁহার সময়ে সাহজাহান, আওরঙ্গজেব, বাহাদুর সা, জাহান্দার সা, ফেরকসের প্রভৃতি সম্রাটগণ দিল্লীতে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। দৈবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরীর পুরোহিত শিবরাম দেবশর্ম্মা ভট্টা-চার্য্য এই সময় বহু সংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক নকল করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত অনেক পুস্তক আগড়ডাঙ্গার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে অদ্যাবধি রক্ষিত হইতেছে। ঐ সমস্ত পুস্তক তিরেট পত্রে লিখিত। দৈবকী-নন্দন শর্ম্মা চৌধুরীর কোন পূর্ব্ব পুরুষ বঙ্গদেশীয় নবাবের নিকট হইতে রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নবাবের রাজস্ব আদায় করিতেন, তজ্জন্য নবাব তাঁহাকে রায় চৌধুরী উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা নামের পর কখন শর্ম্মা চৌধুরী লিখিতেন এবং কখন রায় চৌধুরী লিখিতেন। তবে অধিকাংশ প্রাচীন কাগজে শর্ম্মা চৌধুরী লিখিত আছে। এক্ষণে আমরা নামের পর কেবল চৌধুরী লিখিয়া থাকি। শুনিয়াছি, পার্শিভাষায় চৌধুরি শব্দের অর্থ রাজস্ব-সংগ্রাহক এবং মুসলমান রাজত্বকালে এই উপাধির বিশেষ সম্মান ছিল। হাণ্টার সাহেবের বিখ্যাত ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া * নামক পুস্তকে দৃষ্ট হয় যে, বর্দ্ধমান রাজবংশের কোন পূর্ব্ব পুরুষ তদানীন্তন মুসলমান সম্রাট কর্তৃক চৌধুরী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দৈবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরীর মৃত্যু-তারিখ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। অনুমান করা যায় যে, সন ১১৩০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

---

* The Imperial Gazetteer of India by Sir William Wilson Hunter.

রামগোপাল চৌধুরী।

রামগোপাল চৌধুরী দৈবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরীর সমসাময়িক ব্যক্তি। আমার স্মরণ হইতেছে যে, আমি আমার পিতামহ ৺ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, রামগোপাল চৌধুরী দৈবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরীর কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। রামগোপাল চৌধুরী তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের নিকট হইতে অনেক নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত নিষ্কর ভূমির এক খণ্ডের উপর রামগোপাল চৌধুরীর পত্নী ঠাকুরাণী পুষ্করিণী (ঠাকরুণ পুকুর) নামক একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। এক সময়ে ঐ পুষ্করিণীর জল গ্রামের সমস্ত লোকে পান করিত। এক্ষণে "ঠাকরুণ পুকুরের" অতি শোচনীয় অবস্থা। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর ১৭০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সন ১১০৮ হইতে সন ১১৪৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে রামগোপাল চৌধুরীর পত্নী ঠাকুরাণী পুষ্করিণী (ঠাকরুণ পুকুর) খনন করাইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে "ঠাকরুণ" বলিয়া ডাকিত। তিনি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তজ্জন্য ঐ পুষ্করিণীকে লোকে "ঠাকরুণ পুকুর" বলিত। শুনিয়াছি ঠাকুরাণী পুষ্করিণীর (ঠাকরুণ পুকুরের) পূর্ব্ব ঘাট ইষ্টক-নির্ম্মিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে একটী ইষ্টকও পূর্ব্ব ঘাটে দৃষ্ট হয় না। ১৭০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আওরঙ্গজেব, সাহ আলম (১ম), জাহান্দার সাহ, ফেরকশিয়ার এবং মহাম্মদ সাহ দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন এবং সুলতান আজিমওসান, মুরশিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন এবং সরফরাজ খাঁ ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার নবাব হইয়াছিলেন। মুরশিদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদে

স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। রামগোপাল চৌধুরীর পুত্রের নাম নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। রামগোপাল চৌধুরীর পৌত্রের নাম আদ্যপ নারায়ণ ওরফে অনুপনারায়ণ চৌধুরী। আদ্যপ নারায়ণ চৌধুরী ওরফে অনুপনারায়ণ চৌধুরী সন ১২০৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই বংশের কেহ না থাকায় আনন্দচন্দ্র চৌধুরী ইঁহাদের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরী।

দৈবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরীর পুত্রের নাম সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরী। ইঁহার জন্মের তারিখ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। আনুমানিক ১০৭২ সনে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার সময়ে আওরঙ্গজেব, সাহ আলম, জাহান্দার সা, ফেরক শিয়ার এবং মহম্মদ সা ক্রমান্বয়ে দিল্লীর সম্রাট হইয়াছিলেন এবং সায়েস্তা খাঁ, ফেদাই খাঁ, সুলতান মহম্মদ আজিম, সায়েস্তা খাঁ (২য় বার), ইব্রাহিম খাঁ, সুলতান আজিম ওসান, মুরশিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন, সরফরাজ খাঁ এবং আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালা, বেহার এবং উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। ইঁহার সময় ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সন ১১৪৭ সালে "বর্গির হাঙ্গামা" হইয়াছিল। বর্গিরা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশ লুঠ পাঠ করিয়া প্রজাদিগকে যারপর নাই কষ্ট দিয়াছিল। তাহারা আগড়ডাঙ্গা গ্রামে অনেকের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল এবং অনেক প্রাচীন কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সন ১১৪৮ সালে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বর্গিদিগকে কাটয়ার নিকট পরাস্ত করিয়া, তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বর্গির হাঙ্গামার পাঁচ বৎসর পরে, সন ১১৫২ সালে সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরী মানবলীলা সম্বরণ করেন। সন্তোষ শর্ম্মা

চৌধুরীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে, সন ১১৫৩ সালে নাটোরের রাজা রামকান্ত পরলোক-গমন করেন। ইনি পুণ্যবতী রাণী ভবানীর স্বামী ছিলেন।

সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরীর পুত্রগণ।

সন্তোষচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নির্ণীত হয় নাই। দ্বিতীয় পুত্রের নাম গোকুলচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী, তৃতীয় পুত্রের নাম হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী এবং চতুর্থ পুত্রের নাম দুর্গাচরণ শর্ম্মা চৌধুরী। সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং দ্বিতীয় পুত্র গোকুলচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। তবে জানা গিয়াছে যে, তাঁহারা উভয়েই সন ১২০৮ সালের ১৫ই মাঘের পূর্ব্বে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।

হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী।

সন্তোষচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর নিকট হইতে সন ১১৫৮ সালে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। *

হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরীর সময় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সন ১১৬৩ সালে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সহিত পলাশী নামক স্থানে ইংরাজদের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষে রাজ্য-

* নাটোরের রাজা রামজীবন এবং রাণী ভবানীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সমস্ত জমি আগড়ডাঙ্গার পূর্ব্ব ধুরহুণ্ডা মৌজায় অবস্থিত।

স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার সময় নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী, নদীয়ার বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং বর্দ্ধমানের দানশীল মহারাজাধিরাজ তিলকচাঁদ বাহাদুর অনেক পুণ্যকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। * সন ১১৭৬ সালে ইংরাজি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বাঙ্গলা ১১৭৬ সালে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল বলিয়া, ইহাকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলে। ইংরাজি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে এই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালা দেশের যে ক্ষতি হইয়াছিল, সে ক্ষতি দুই পুরুষেও পূর্ণ করিতে পারে নাই। এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালা দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। গাছের পাতা খাইয়া লোকে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল এবং শেষে জীবন রক্ষার জন্য মানুষ মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইংরাজি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এই মন্বন্তর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। কৃষকেরা তাহাদের গরু মহিষ প্রভৃতি বিক্রয় করিল, লাঙ্গল কোদাল প্রভৃতি চাষের দ্রব্য বিক্রয় করিল, বীজশস্য খাইয়া ফেলিল, প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকন্যাগণকে বিক্রয় করিল,—অবশেষে আর ক্রেতা মিলিল না। তাহারা গাছের পাতা এবং ময়দানের ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। ইংরাজি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মানুষ প্রাণরক্ষার জন্য মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধিপীড়িত ব্যক্তিগণ জলস্রোতের ন্যায় দিবারাত্র বড় বড় নগরে প্রবেশ করিয়াছিল। এই বৎসরের প্রারম্ভে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছিল। মার্চ্চ মাসে মুর্শিদাবাদে বসন্তরোগ দেখা দিয়াছিল। মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের এবং মৃত দেহের বৃহৎ বৃহৎ স্তূপে প্রশস্ত রাজপথসমূহ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শৃগাল

* The Annals of Rural Bengal by Sir W. W. Hunter K. C. S. I. দ্রষ্টব্য।

কুকুরে মৃতদেহ খাইয়া শেষ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকাভাবে বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ ভূমিতে চাষ হয় নাই, পতিত ছিল।

হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরীর সময় ইংরাজেরা সন ১১৭২ সালে অর্থাৎ ইংরাজি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দিল্লীর বাদসাহ (সম্রাট) সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ইংরাজেরা বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার সময় সন ১১৮১ সালে ব্রাহ্মধর্ম্ম-স্থাপনকর্ত্তা রাজা রামমোহন রায় হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার সময় সাধক, শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং ভারতচন্দ্র রায় বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। এই সময় সন ১১৮০ সালে সাধক কবি কমলাকান্ত বর্দ্ধমান জেলার কালনা-নগরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় রাণী ভবানী সন ১২০৩ সালে স্বর্গলাভ করেন। হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরীর সময় ক্লাইভ এবং ভান্সিটার্ট বাঙ্গলার গভর্ণর ছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্, লর্ড কর্ণওয়ালিস্, সার জন সোর ও মারকুইস্ অব ওয়েলেস্‌লি, ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন। এই সময় ভারতবর্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করেন। এতদিন পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদের নবাব বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সৈন্যসংক্রান্ত এবং রাজ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় ভার, করসংগ্রহ, দেওয়ানি বিচার, ফৌজদারি বিচার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য নবাবের হাতে ছিল। দেওয়ানি গ্রহণের পর সৈন্যসংক্রান্তভার

এবং কর-সংগ্রহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসিল, কেবল ফৌজদারি বিচার ও পুলিস নবাবের হাতে থাকিল। দেওয়ানি বিচার কোম্পানী নিজের হাতে লইয়াছিলেন, তবে দেওয়ানি, ফৌজদারি সমস্ত বিচার দেশীয় কর্ম্মচারী দ্বারা সম্পাদিত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাটকে বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা এবং মুর্শিদাবাদের নবাবকে তাঁহার এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদের বেতন-স্বরূপ বৎসরে তিপান্ন লক্ষ টাকা দিতেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তন করেন। তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গভর্ণর ছিলেন এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পূর্ব্বে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেরেলষ্ট সাহেব, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর্টিয়ার সাহেব, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্লাইভ, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভন্সিটার্ট এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্লাইভ (পুনর্ব্বার) বাঙ্গালার গভর্ণর ছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ বাদসাহের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করেন। এই হেতু সেই সময় হইতে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসন-প্রণালী ও রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ভার ইংরাজের হস্তে আসিয়াছিল। তাঁহারা শাসনপ্রণালী অপেক্ষা রাজস্ব আদায় বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দিলেন। তখন এদেশীয় কর্ম্মচারী দ্বারা উক্ত রাজস্ব আদায় করান হইত। ইংরাজেরা প্রথমে এ নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর কার্টিয়ার সাহেবের সময়, দেশীয় কর্ম্মচারীদের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় নায়েব-দেওয়ানী পদ উঠিয়া গেল; তখন মহম্মদ

রেজা খাঁ নায়েব-দেওয়ান ছিলেন। তখন ইংরাজেরা প্রকাশ্যভাবে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার দেওয়ান হইলেন এবং সেই অবধি আপনাদের নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময়ে কালেক্টারের পদ প্রথম সৃষ্টি হয়। সেই সময় এ দেশীয় জমি পাঁচ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য কালেক্টরদের উপর ভার দেওয়া হয়। ঐ সময় দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় দুইটী করিয়া বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল। দেওয়ানি মোকদ্দমা বিচারের এবং তৎসংক্রান্ত সমস্ত ভার জেলার কালেক্টার সাহেবদের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। ফৌজদারি মোকদ্দমা বিচারের ভার মুসলমান কাজী ও মুফতির হস্তে ছিল। তবে ফৌজদারি মোকদ্দমাতেও কালেক্টার সাহেবের কর্ত্তৃত্ব ছিল। সেই সময় কলিকাতায় দুইটী আপীল আদালত স্থাপিত হয়—দেওয়ানি আপীল শুনিবার জন্য সদর দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি আপিল শুনিবার জন্য সদর নিজামত আদালত।

এতদিন পর্য্যন্ত কোম্পানির অধ্যক্ষেরা এ দেশের রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট এই ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য এ দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রথম নিয়মাবলী প্রচার করিলেন। এই নিয়মাবলী নিম্নে লিখিত হইল।

১। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে, বাঙ্গালাকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণনা করা হইবে। বাঙ্গালার গভর্ণর "গভর্ণর জেনারেল" বলিয়া কথিত হইবেন এবং তথায় একটী "কৌন্সেল" অর্থাৎ মন্ত্রীসভা স্থাপিত হইবে। চারিজন মেম্বর সেই সভার সভ্য নিযুক্ত হইবেন। বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা "গভর্ণর জেনারেলের" এবং এক লক্ষ টাকা

করিয়া কৌন্সিলের প্রত্যেক মেম্বারের বেতন ধার্য্য হইল। সকৌন্সেল গভর্ণর-জেনারেলের কর্তৃত্ব মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উপরেও থাকিবে।

২। "সুপ্রিম কোর্ট" নামে একটী নূতন বিচারালয় কলিকাতায় স্থাপিত হইবে। তাহাতে একজন চিফ্ জ্যাষ্টিস্ ও তিনজন পিউনি জজ নিযুক্ত হইবেন। এই বিচারালয় স্থাপিত হইলে, পূর্ব্বে যে "মেয়ার্স কোর্ট" ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছিল।

৩। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজকার্য্য-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় ইংলণ্ডীয় রাজমন্ত্রীর গোচর করিতে হইবে। কোম্পানির কর্ম্মচারীগণ কোনরূপ উপহার বা উৎকোচ গ্রহণ অথবা বাণিজ্য-ব্যবসায় করিতে পারিবেন না।

৪। পূর্ব্বে ডাইরেক্টর সভায় ২৪ জন মেম্বর ছিলেন। তাঁহারা প্রতিবৎসর মনোনীত হইতেন। এক্ষণে নিম্নলিখিত নূতন নিয়ম হইল :—

৬ জন ডাইরেক্টর এক বৎসরের জন্য, ৬ জন ডাইরেক্টর দুই বৎসরের জন্য, ৬ জন ডাইরেক্টর তিন বৎসরের জন্য, ৬ জন ডাইরেক্টর চারি বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন।

উপরোক্ত নিয়মানুসারে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ "গভর্ণর জেনারেল" নিযুক্ত হইলেন ; বারোওয়েল, জনসন, ক্লেবারিং ও ফ্রান্সিস্ "কৌন্সেলের" মেম্বর এবং সার ইলাইজা ইম্পে "সুপ্রিম কোর্টের" প্রধান বিচারকের পদে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে হেষ্টিংস্ ও বারওয়েল সাহেব পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে ছিলেন। কৌন্সিলের অপর তিনজন মেম্বর এবং ইম্পে প্রভৃতি জজেরা ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরদিগের মধ্যে, কেবল বারওয়েল সাহেবের সহিত হেষ্টিংসের সদ্ভাব ছিল, অপর তিন জন মেম্বরের সহিত হেষ্টিংসের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। হেষ্টিংস এ দেশে অনেক বিষয়ে উৎকোচ

ও অর্থগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কথা মহারাজ নন্দকুমার কৌন্সিলে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি কুপিত হইয়া, তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। প্রথমে হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অপবাদ দেন যে, তিনি হেষ্টিংস্ এবং অন্যান্য কয়েকজন ইংরাজের সর্ব্বনাশের জন্য চক্রান্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। শেষে মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালকরা অপবাদ দিয়া, এক মোকদ্দমা উপস্থিত করে। সুপ্রিম কোর্টে এই মোকদ্দমার বিচার হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হেষ্টিংসের পরম বন্ধু সার ইলাইজা ইম্পে এই মোকদ্দমায় মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম দেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, ইহা জানিবার জন্য প্রত্যেক পাঠককে আমি "বার্ক স্পীচ্" পড়িতে অনুরোধ করি। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমি উহা বর্ণনা করিলাম না। ভদ্রপুর বা ভাদুর মহারাজ নন্দকুমারের নিবাস ছিল। ভদুর এক্ষণে বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার অধীন। পূর্ব্বে উহা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল। মহারাজ নন্দকুমার এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী প্রভৃতি আগড়ভাঙ্গার ব্রাহ্মণগণও নিমন্ত্রিত হইয়া ভাদুর গিয়াছিলেন। এক্ষণে ভাদুরে মহারাজ নন্দকুমারের বাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইঁহার বংশের কেহ নাই। কুঞ্জঘাটার রাজারা ইঁহার দৌহিত্র-বংশীয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং কাশিমবাজারের দানশীল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পূর্ব্ব পুরুষ কান্তবাবু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কৃপায় অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পাঠককে একবার "বার্ক স্পীচ্" পড়িতে অনুরোধ করি।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে বোর্ড অব রেভেনিউ নামক একটী সভা স্থাপিত হয়। বাঙ্গালাদেশের রাজস্বের তত্ত্বাবধান করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভায় চারিজন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। প্রথমেই মেম্বরেরা এই নিয়ম করেন যে, তদনীন্তন জমিদারেরা অনিচ্ছা প্রকাশ না করিলে, কিম্বা অসমর্থ না হইলে, তাঁহাদের সহিত পূর্ব্ব বন্দোবস্ত বাহাল রাখা হইবে। ইহার অন্যথা হইলে, অপরের সহিত জমিদারির বন্দোবস্ত করা হইবে। জমিদারির সংক্রান্ত এইরূপ বন্দোবস্ত বৎসর বৎসর হইতে থাকিবে। যাঁহারা নিয়মিতরূপে কর দিতে পারিবেন, কেবল তাঁহাদেরই সহিত বন্দোবস্ত স্থায়ী থাকিবে।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে ডাইরেক্টারেরা ইচ্ছা করেন যে, বিবাহ, উত্তরাধিকার, চুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী এবং মুসলমানদিগের মুসলমান আইন-অনুসারে বিচার হইবে। এই কারণে হ্যাল্‌হেড সাহেব হিন্দু ও মুসলমানদিগের আইন সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ ছিল না এবং বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। হ্যাল্‌হেড সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমে ব্যাকরণ রচনা করেন এবং উহা ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ছাপাইয়াছিলেন। যে সকল অক্ষরের সাহায্যে এই ব্যাকরণ ছাপান হইয়াছিল, চার্লস উইলকিন্স সাহেব সে সকল অক্ষর ক্ষোদিত করিয়াছিলেন। এইরূপে বাঙ্গালা ছাপার অক্ষরের সৃষ্টি হইল।

পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্র ছিল না। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় প্রথম "সংবাদপত্র" মুদ্রিত হয়।

পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশীয় রাজশাসন-সংক্রান্ত নূতন নিয়ম হইয়াছিল। ইংলণ্ডে "বোর্ড অব কণ্ট্রোল" নামক একটী সভা স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের "প্রিবি কাউন্সিলের" ছয় জন সদস্য এই সভার

সভ্য নিযুক্ত হইলেন। গভর্ণর জেনারল বাহাল এবং অন্যান্য অত্যাবশুক কার্য্যে তাঁহারই কর্ত্তা হইলেন। সম্পূর্ণরূপে ডাইরেক্‌টরেরা তাঁহাদের অধীন হইলেন।

সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্বে কোন রাজকীয় বিদ্যালয় ছিল না। সর্ব্বপ্রথমে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কলিকাতায় মাদ্রাসা সংস্থাপন করেন। তাঁহার শাসনকালে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স "সুপ্রিম কোর্টের" জজ হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। জোন্স সাহেব ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে "এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামক প্রসিদ্ধ সভা স্থাপন করেন। এই সভা অসংখ্য প্রাচীন পুস্তকের উদ্ধার করিয়াছে।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই হেষ্টিংস্ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তারপর কৌন্সিলের মেম্বর মাক্‌ফারসন সাহেব কুড়ি মাস ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের শেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল ও কমাণ্ডার-ইন্-চিফ্ (সেনাপতি) নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন।

হেষ্টিংস্ সাহেবের সময়ে, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বৎসর বৎসর জমিদারদের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও লাভ হইত না এবং জমিদারদেরও লাভ হইত না। জমিতে ভাল শস্য হইলে আগামী বৎসর অধিক রাজস্ব ধার্য্য হইবে—এই ভয়ে জমিদারেরা কৃষিকার্য্যের উন্নতি চেষ্টা করিতেন না। বৎসরের শেষে জমিদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে সমস্ত রাজস্ব আদায় করিয়া উঠিতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত জমিদারদিগকে ঋণ করিয়া রাজস্ব দিতে হইত অথবা তাঁহাদিগকে জমিদারি পরিত্যাগ করিতে হইত। ইহাতে জমিদার ও গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইত। এই নিমিত্ত লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ডাইরেক্‌টরদিগের অনুমতি লইয়া, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব

নির্দ্দিষ্ট করিয়া জমিদারদের সহিত দশ বৎসরের জন্য জমিদারী বন্দোবস্ত করেন এবং কথা থাকে যে, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অনুমোদন করিলে, এই "দশশালা" বন্দোবস্ত "চিরস্থায়ী" হইবে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষদের অনুমোদন-পত্র পৌঁছিলে, "দশশালা" বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইল। এতদ্বারা এই নিয়ম হইল যে, জমিদারগণ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের অধিকৃত জমি ভোগদখল করিতে পারিবেন। তবে বৎসরের মধ্যে কয়েকটী নির্দ্ধারিত দিবসে রাজস্ব দিতে না পারিলে, তাঁহাদের জমিদারী নিলাম হইবে। জমিদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে দেশের প্রচলিত হার অনুসারে খাজনা লইবেন, কিন্তু প্রজারা খাজনা দিতে না পারিলে, জমিদারেরা স্বয়ং তাহাদের জমি নিলাম করিতে পারিবেন না। যে সকল নিষ্কর জমির পাকা সনন্দ-পত্র ছিল, তাহা গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লন নাই।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এ দেশের সুশাসনের নিমিত্ত কতকগুলি আইন প্রচার করেন। ফষ্টর সাহেব এই সমস্ত আইনের বঙ্গানুবাদ করেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় হইতে, এতদিন পর্য্যন্ত জেলার কালেক্টরদিগের উপর রাজস্ব-সংগ্রহের এবং দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচার করিবার ভার ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কালেক্টরদিগের উপর কেবলমাত্র রাজস্ব-সংগ্রহের ভার রাখিলেন, কোন মোকদ্দমার বিচার-ক্ষমতা রাখিলেন না। দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারার্থে নিম্নলিখিত বিচারালয়সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল।

১। সমস্ত আদালতের উপরে, কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল। তথায় স্বয়ং গভর্ণর-জেনারেল এবং কৌন্সিলের মেম্বরগণ বিচার করিতেন।

২। সদর দেওয়ানী আদালতের নীচে কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা

এবং পাটনা—এই চারিটী নগরে, চারিটী প্রভিন্সিয়াল কোর্ট স্থাপিত হইল। প্রত্যেক প্রভিন্সিয়াল কোর্টে চারিজন করিয়া বিচারক নিযুক্ত হইলেন।

৩। প্রভিন্সিয়াল কোর্টের নীচে প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া জজ নিযুক্ত হইলেন।

৪। জেলার জজের নীচে রেজিষ্ট্রার এবং মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

প্রত্যেক নিম্ন আদালতের বিচারিত মোকদ্দমার আপীল তদুপরিস্থ আদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন হইত।

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারভার মুসলমানরাজত্ব হইতে এতদিন পর্য্যন্ত মুসলমান কর্ম্মচারীগণের হস্তেই ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহাদের হস্ত হইতে বিচার-ক্ষমতা উঠাইয়া লন। এই সময় জেলার জজ সাহেবদের উপর সামান্যরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল এবং প্রভিন্সিয়াল কোর্টের জজেরা প্রত্যেক জেলায় বৎসরে দুইবার যাইয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জজসাহেবদের সোপর্দ্দ ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। ইহাদিগকে সারকুট-জজ বলিত। সারকুট জজদিগের বিচারিত মোকদ্দমার আপীল কলিকাতার সদর নিজামত আদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন হইত। ফৌজদারী বিচারালয় হইতে মুসলমান বিচারকগণ দূরীভূত হইলেন, কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার মুসলমান-আইন অনুসারে চলিতে থাকিল। কতকগুলি অপরাধে মুসলমান আইনে অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই সময় তৎপরিবর্ত্তে দীর্ঘকাল কারাদণ্ডের বিধান হইল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ শান্তিরক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলায় কয়েক ক্রোশ অন্তর একটী করিয়া থানা স্থাপন করিলেন এবং প্রত্যেক থানায় একজন কার্[illegible]

২৫৲ টাকা ধার্য্য হইল। দারগাগণ ম্যাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতাপ্রাপ্ত জজসাহেবদের অধীন ছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে থানাদারগণ ও চৌকিদারগণ বেতনের পরিবর্ত্তে নিষ্কর জমি ভোগ করিত। এক্ষণে থানাদার পদের নাম হইল দারগা এবং তাহারা নিষ্কর জমির পরিবর্ত্তে মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইতে থাকিল এবং চৌকিদারগণ পূর্ব্ববৎ বেতনের পরিবর্ত্তে নিষ্কর জমি ভোগ করিতে থাকিল। চৌকিদার নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা পূর্ব্বের ন্যায় জমিদারদের হস্তেই থাকিল। চৌকিদার-গণকে দিবসে জমিদারদের কার্য্য করিতে হইত এবং রাত্রিতে গ্রামে পাহারা দিতে হইত। সেই সময় চৌকিদারগণ দুইজন প্রভুর ভৃত্য ছিল। জমিদারগণই চৌকিদারদের প্রধান প্রভু ছিলেন। তাঁহারা চৌকিদার নিযুক্ত করিতেন, দিবসে তাহাদিগকে কার্য্য করাইতেন এবং চৌকিদারগণ কার্য্যতঃ জমিদারগণেরই সাক্ষাৎ শাসনাধীন ছিল। যেরূপ সংবাদ দিলে জমিদারেরা সন্তুষ্ট হইতেন, চৌকিদারগণ ঠিক সেইরূপ সংবাদই ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিত। বর্ত্তমান সময়ের মত সাব্ইনেস্পেক্টরের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কোন রাজপুরুষ চৌকিদারকে সাজা দিতে পারিতেন না। যদি কোন চৌকিদার রাত্রে পাহারা না দিয়া নিদ্রা যাইত, তাহা হইলে তাহাকে সাজা দেওয়াইবার জন্য আদালতে অভিযোগ করিতে হইত, সাক্ষীগণকে হাজির করিতে হইত এবং সরকারী উকিল নিযুক্ত করিতে হইত এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পর চৌকিদারের দশ আনা কি বার আনা অর্থদণ্ড হইত। চৌকিদারকে পুরস্কার দিবার কিংবা তাঁহার পদোন্নতি করিবার ক্ষমতা ম্যাজিষ্ট্রেটের ছিল না। *

মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষের লোকে অনেক উচ্চ রাজকর্ম্ম পাইতেন। ফৌজদার হইলে বার্ষিক ৬০।৭০ হাজার এবং নায়েব-

* Annals of Rural Bengal by Sir William Wilson Hunter.

দেওয়ান হইলে বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা পাইতেন। এক্ষণে তাঁহাদের আর এরূপ উচ্চ রাজকর্ম্ম পাইবার আশা থাকিল না। তাঁহারা উচ্চ কর্ম্মের মধ্যে দারগাগিরি ও মুন্সেফি পাইতে থাকিলেন। দারগার মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা এবং মুন্সেফরা মোকদ্দমার দাবী অনুসারে কমিসন পাইতেন। কিন্তু ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতন বর্দ্ধিত হইল।

জমিদারেরা কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে পাইবেন না, এরূপ নিয়ম হওয়াতে জমিদারদের ক্ষমতা নষ্ট হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজস্ব দিতে না পারিলে জমিদারী নিলাম হইবে এরূপ নিয়ম হওয়াতে, এই সময় হইতে অনেক বড় বড় জমিদার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ স্বদেশ যাত্রা করেন।

সার্ জন শোর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন। এই সময়ে ইংরাজেরা সিংহল দ্বীপ অধিকার করেন।

মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি এ দেশের একটী ভয়ানক কুপ্রথা রহিত করেন। সন্তান না হইলে অনেকে গঙ্গাসাগরে সন্তান কামনা করিত এবং সন্তান হইলে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ গঙ্গাসাগরে প্রথম সন্তানটী নিক্ষেপ করিত। তিনি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন। সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত—এই দুইটি আদালতের কার্য্যভার গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিলের মেম্বরগণের হাতে ছিল; লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই দুইটি আদালতকে একটী আদালতে পরিণত করিয়া, ইহার "সদর আদালত" নাম দিয়া, তিনজন জজের উপর এই আদালতের বিচারভার অর্পণ করেন। বহুবিদ্যাবিশারদ কোলব্রুক সাহেব প্রথম নিযুক্ত তিনজন জজের মধ্যে একজন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি কলিকাতায় "ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ" নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর কোন কলেজ সংস্থাপিত হয় নাই। বিলাতী সিভিল সার্ভাণ্টদিগকে এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত কতকগুলি বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক লিখিত হইয়াছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে "লিপিমালা" ও রাজীবলোচনের "কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত" প্রণীত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলী" এবং কেরীসাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান এই সময়েই বিরচিত হইয়াছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পাদ্রি মার্সমান ও উয়ার্ড সাহেব বাঙ্গালাদেশে আসিয়া শ্রীরামপুরে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাঁহারা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামায়ণ ছাপাইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে আর কোন মিশনারী ভারতবর্ষে আসিয়া বিদ্যাদান করেন নাই। লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী সন ১২০৮ সালের ১৫ই মাঘ, ইংরাজি ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, তাঁহার নিষ্কর সম্পত্তির একটী তালিকা কালেক্টারীতে দাখিল করিয়াছিলেন। ঐ তালিকা এক্ষণে বর্দ্ধমানের কালেক্টারীতে আছে। ঐ তালিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরী সন ১২০৮ সালের ১৫ই মাঘ তারিখে জীবিত ছিলেন। তবে কোন্ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই।

বিশ্বেশ্বর চৌধুরী।

হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধুরীর একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বর চৌধুরী কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কোন্ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। তবে তিনি সন ১২৪৯ সালের ৭ই চৈত্র তারিখে জীবিত ছিলেন না, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। বিশ্বেশ্বর চৌধুরী অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার পত্নী হরসুন্দরী দেবী কোন্ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই; তবে তিনি বিধবাবস্থায় সন ১২৫২ সালের ১২ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন,তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। তিনি জীবিতাবস্থায় কিছু সম্পত্তি আনন্দচন্দ্র চৌধুরীকে বিক্রয় করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর, আনন্দচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। এইরূপে হরগোবিন্দ শর্ম্মা চৌধু-রীর বংশ লোপপ্রাপ্ত হইল।

সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরীর প্রথম পুত্রের বংশ।

সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরীর প্রথম পুত্রের নাম নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। প্রথম পুত্রের পুত্রসন্তান ছিল কিনা, তাহাও জানা যায় নাই, তবে জানা গিয়াছে যে, প্রথম পুত্রের কন্যার নাম ভগবতী দেবী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের রামলোচন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ভগবতী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। ভগবতী দেবীর পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার কয়টী কন্যা ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতার নাম বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের নাম পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম আনন্দময়ী

দেবী। পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর নাম গঙ্গামণী দেবী। পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আগড়ডাঙ্গার কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র রায়ের কন্যা ক্ষুদুমণী দেবীর সহিত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল। ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিঃসন্তান ছিলেন।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মাতা গঙ্গামণী দেবী আনন্দচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। ইংরাজি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল, অর্থাৎ সন ১২৬৫ সালের ১১ই বৈশাখ তারিখে জেলা বীরভূমের অন্তর্গত চৌকী কান্দরার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী তোফেল আহাম্মদ এই মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন। গঙ্গামণী দেবী ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী নামক একজন উকিলকে আপনপক্ষে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং আনন্দচন্দ্র চৌধুরী সৈয়দ হোসেন আলি ও নদেরচাঁদ ঘোষ নামক দুইজন উকিলকে স্বপক্ষে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরম ধার্ম্মিক, সত্যবাদী আনন্দচন্দ্র চৌধুরী গঙ্গামণী দেবীর উক্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ গঙ্গামণী দেবী ঐ মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। বহুদিন গত হইল, কান্দরার মুন্সেফী আদালত কাটয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। কান্দরা এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার কাটয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন পত্নীর গর্ভেই সন্তান হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মাতা এবং প্রথমা পত্নী ক্ষুদুমণী দেবীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম এবং কোন্ সময় মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জীবিতাবস্থায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন।

সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরীর চতুর্থ পুত্রের বংশ।

দুর্গাচরণ শর্ম্মা চৌধুরী।

সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরীর চতুর্থ পুত্রের নাম দুর্গাচরণ শর্ম্মা চৌধুরী। দুর্গাচরণ শর্ম্মা চৌধুরী কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কোন্ সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। তবে তিনি সন ১২০৯ সালের চৈত্র মাসে জীবিত ছিলেন, তাহা জানা গিয়াছে। তিনি ঐ সময়ে তাঁহাদের নিষ্কর সম্পত্তির তালিকা কালেক্টারিতে দাখিল করিয়াছিলেন। ঐ তালিকা এক্ষণে বর্দ্ধমান কালেক্টারিতে আছে।

যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা চৌধুরী।

দুর্গাচরণ শর্ম্মা চৌধুরীর পুত্রের নাম যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা চৌধুরী। যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা চৌধুরী আগড়ডাঙ্গার দেড় ক্রোশ পূর্ব্ব দত্তপড়্যে গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে আগড়ডাঙ্গা হইতে দত্তপড়্যে যাইবার সময় তিনি একদল ডাকাইতের সম্মুখে পতিত হইয়াছিলেন। ডাকাইত-দল ঐ সময় গোপনে মাঠে কালীপূজা করিতেছিল। পূজা সমাপ্ত হইলে তাহারা ডাকাইতি করিতে যাত্রা করিবে। কয়েকজন ডাকাইত অন্ধকারে মাঠের মধ্যে এরূপ অসময়ে অতি শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত একটী মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া, ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?" মনুষ্য-মূর্ত্তি উত্তর করিলেন,—"যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা চৌধুরী।" দস্যুদলপতি দূর হইতে এই উত্তর শ্রবণ করিয়া বলিল,—"ওরে! উনি আমার বাপ, উঁনি আমার মুনিব, তোরা একজন চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে যেয়ে দত্তপড়্যে গাঁয়ে রেখে আয়।" এই আদেশ শ্রবণমাত্র, একজন দস্যু যজ্ঞেশ্বর

শর্ম্মা চৌধুরীকে দত্তপড়ে গ্রামে রাখিয়া আসিতে যাত্রা করিল এবং তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিল। যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা চৌধুরী অনেক সম্পত্তি আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। সন ১২৪৯ সালের ২৮শে বৈশাখ, ইংরাজি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে কান্দরা গ্রামের মুন্‌সেফি আদালতে, যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা চৌধুরী, ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী ও ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল। ঐ মোকদ্দমার বাদী আগড়ডাঙ্গা-নিবাসী রাজচন্দ্র সরকার। এই মোকদ্দমাটী ইংরাজি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২৯৪ নম্বরে রেজেষ্টারিভুক্ত হইয়াছিল। মুন্‌সেফ মেজা মহাম্মদ আস্কার খান ফেকরজ এই মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন। কান্দরা তখন বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কোন্ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। জানা গিয়াছে যে, তিনি সন ১২৭৯ সালে জীবিত ছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা চৌধুরীর পুত্রের নাম প্রতাপচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী। আনুমানিক সন ১২৪০ সালে প্রতাপচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতে দত্তপড়ে গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের এবং বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ম্মের সময় আগড়ডাঙ্গায় আগমন করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ ছিলেন। আমার পিতামহ ত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মা চৌধুরী তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকিতেন এবং আমার পিতা তারিণীপ্রসাদ শর্ম্মা চৌধুরী এবং খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ শর্ম্মা চৌধুরী তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিতেন। আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশে সুরাপান নিষিদ্ধ। দত্তপড়ে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই শাক্ত। তিনি তাঁহাদের সংস্রবে থাকিয়া

শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সময় সময় সামান্য পরিমাণে সুরাপান করিতেন। দুর্গোৎসবের সময় দুই এক বোতল মদ্য আগড়ডাঙ্গায় আনিয়া, চৌধুরীদের সৎগোপ প্রজাদের বাটীতে লুকাইয়া রাখিতেন এবং রাত্রে দুই একজন সঙ্গীসহ গোপনে পান করিতেন। আনুমানিক সন ১৩০০ সালে দত্তপড্ডে গ্রামে মাতুলালয়ে গ্রহণী রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। আগড়ডাঙ্গা হইতে দত্তপড্ডে যাইয়া ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়া শ্রাদ্ধ দেখিয়াছিলাম। প্রতাপচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী বিবাহ করেন নাই। অতএব তাঁহার মৃত্যুসহিত তাঁহার বংশলোপ হইল।

সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্রের বংশ।

গোকুলচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী।

গোকুলচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী সন্তোষ শর্ম্মা চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জন্মমৃত্যু-তারিখ স্থিরীকৃত হয় নাই। এক্ষণে কেবল মহাত্মা গোকুলচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর বংশ বর্ত্তমান আছে। অপর সকলের বংশ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতিথি-সৎকার এবং অনাথজনপালন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। গোকুলচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রের নাম বৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী, একটী কন্যার নাম রুক্মিণী দেবী, অপর দুইটী কন্যার নাম নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই।

বৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী গোকুলচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। তাঁহার জন্মমৃত্যু-তারিখ নির্ণীত হয় নাই। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায়

ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার পত্নী একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। একদিন রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কবিরাজেরা অনুমান করেন যে, হঠাৎ বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চার হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সন ১২০০ সালের পূর্ব্বে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী তখন নয় দশ বৎসর বয়স্ক বালক।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী বৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। তিনি আনুমানিক সন ১১৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নয় দশ বৎসর বয়সে পিতামাতৃহীন হইয়া, আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী তাঁহার জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার বহুসংখ্যক ধাতু-প্রস্তরনির্ম্মিত আসন, লৌহনির্ম্মিত খড়্গ, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র এবং প্রস্তরনির্ম্মিত শিল, জাঁতা প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যোপযোগী দ্রব্য ছিল। বালক আনন্দচন্দ্রের নিকট গ্রামবাসিগণ ঐ সকল দ্রব্যের যাহা প্রার্থনা করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাহাকে সেই দ্রব্য প্রদান করিতেন। বাল্যকালে আনন্দচন্দ্র এরূপ পরিশ্রম ও মনঃসংযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতেন যে, অনেক সময় আহার করিতে বিস্মৃত হইতেন। ফলতঃ অতি অল্প সময়ে, তিনি তৎকালীন বাঙ্গালা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞাতিগণ আগড়ডাঙ্গার ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর কন্যা ব্রহ্মময়ী দেবীর সহিত আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর বিবাহ দিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে জনৈক সন্ন্যাসী আনন্দচন্দ্রের দীর্ঘ, স্থূল এবং বলিষ্ঠ কলেবর, প্রশস্ত বক্ষ, আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু, উন্নত ললাট, গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি এবং আরও কতিপয় সুলক্ষণ

দর্শন করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে,—"বৎস! মা লক্ষ্মী অন্তিম-কাল পর্য্যন্ত তোমার অনুগামিনী হইবেন, অন্নদান এবং নিঃস্বার্থ পরোপকার তোমার জীবনের মহাব্রত হইবে।" আনন্দচন্দ্র আগড়ডাঙ্গার চারিক্রোশ পূর্ব্ব তালিবপুর গ্রামের মুসলমান জমিদারদের অধীনে কার্য্য করিতেন। তৎকালীন ভূম্যধিকারিগণের কর্ম্মচারীর বেতন অল্প হইলেও, তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাই সঞ্চিত হইত। কারণ তাঁহার আবশ্যকীয় বস্ত্র, চাউল, তৈল, লবণ প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্য তাঁহার বাটী হইতে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইত। সে সময় ভদ্রলোকদিগকে লবণ ভিন্ন আর কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে হইত না। ভূমিতে কার্পাস জন্মিত, স্ত্রীলোকেরা সূত্র প্রস্তুত করিত এবং তন্তুবায়গণ পারিশ্রমিক-স্বরূপ চাউল গ্রহণ করিয়া বস্ত্র বয়ন করিয়া দিত। ধান্য, কলাই, তৈল-জনক শস্য, ইক্ষু, পাট, শন এবং তরকারি প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ভূমিতে উৎপন্ন হইত। তাঁহার জ্ঞাতিগণের মধ্যে কেহ কখন কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহা ক্রয় করিতেন। তিনি অনেক বিষয় উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্য লোকেরও অনেক সম্পত্তি তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, সন ১২৭০ সালের মাঘ মাসে, বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত চুপীগ্রামে, তিনি একটি মূল্যবান্ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বপ্নেও কখন চিন্তা করেন নাই যে, চুপীর সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইবে। সন ১২৭০ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষাংশে একদিন চুপীর হরমোহন রায় মহাশয়ের প্রেরিত জনৈক ভদ্রলোক আগড়ডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া, আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর নিকট প্রকাশ করেন,—"চুপীর ৺রামগোপাল রায় মহাশয়ের পত্নী উমাসুন্দরী দেবী সন ১২৭০ সালের ১৯শে কার্ত্তিক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, রামগোপাল

রায় মহাশয়ের প্রপিতামহের বংশে কেহ জীবিত নাই, আপনি তাঁহার মাতামহ ৺ গোকুলচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর পৌত্র, অতএব আপনি এক্ষণে রামগোপাল রায় মহাশয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, উক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ১৩১৸৪ একশত একত্রিশ বিঘা উনিশ কাঠা নিষ্কর ভূমি। সকল ভূমি বৰ্দ্ধমান কালেক্টারির সন ১২০৯ সালের ১৩৩৩৫ নম্বর তায়দাদ-ভুক্ত, ইহাতে আপনার যথেষ্ট আয় হইবে।” আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী বলিলেন, “সম্পত্তিটী লাভজনক, তাহা আমি জানি, কিন্তু ভূমিগুলা বহুদূরে অবস্থিত এবং হস্তগত করা বিশেষ কষ্টকর, আমি বৃদ্ধ বয়সে এত কষ্ট করিতে পারিব না, আমার সম্পত্তিতে কাজ নাই।” ভদ্রলোকটী বলিলেন,—“আপনাকে একটী পয়সা খরচ করিতে হইবে না, কোন কষ্ট করিতে হইবে না; চুপীনিবাসী হরমোহন রায় মহাশয় বৰ্দ্ধমানের মহারাজার দেওয়ান, পূর্ব্বস্থলী, কালনা এবং বৰ্দ্ধমানাঞ্চলে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি, তিনি খরচপত্র সমস্ত করিবেন, তবে আপনি ঐ বিষয়টী খাজনা ধার্য্য করিয়া রায় মহাশয়কে বিলি করিবেন।” আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইংরাজি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭ আইনের বিধানক্রমে সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত, তিনি হরমোহন রায় মহাশয়ের সাহায্যে বৰ্দ্ধমানের জজ সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন। সন ১২৭০ সালের মাঘ মাসে নলীপুর হইয়া, ভাগীরথী-বক্ষে নৌকাযোগে তিনি চুপীযাত্রা করিলেন। চুপী পৌঁছিয়া, জজ সাহেবের সার্টিফিকেট পাইবার পূর্ব্বেই, তিনি বার্ষিক ৬৭৲ টাকা রাজস্ব ধার্য্যে উক্ত সম্পত্তি হর-মোহন রায় মহাশয়কে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করিলেন এবং এই মর্ম্মে রায় মহাশয়কে পাট্টা লিখিয়া দিলেন ও রায়মহাশয় তাঁহাকে কবুলতি লিখিয়া দিলেন। উক্ত পাট্টা এবং কবুলতিতে প্রকাশ থাকিল যে, জজ সাহেবের নিকট সার্টিফিকেট পাইলে, হরমোহন রায় মহাশয়

তাঁহাকে, বার্ষিক রাজস্ব ব্যতীত ১৫০৲ টাকা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য একবার প্রদান করিবেন। উক্ত পাট্টা-কবুলতি রেজেষ্টারী হইলে, আনন্দ-চন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী বাটী যাত্রা করিলেন। শুনিয়াছি যে, পাট্টা-কবুলতি রেজেষ্টারী করিবার জন্য, তাঁহাকে কালনা পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছিল। কালনা তখন 'অম্বিকা-কালনা বলিয়া কথিত হইত। বাটী যাত্রাকালে, পথিমধ্যে সন্ধ্যার পর নৌকা দাঁইহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাঁইহাট তখন ভাগীরথী-তটে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী দাঁই-হাটের একক্রোশ দূরে প্রবাহিতা হইতেছেন। সেই বৎসর তিনি দাঁই-হাটের বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত স্বীয় পৌত্রী গোলাপসুন্দরী দেবীর উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নৌকা দাঁইহাটে উপস্থিত হইলে, তিনি বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া সংবাদ পাঠাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া, অনতিবিলম্বে বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নৌকায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের বাটী যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। চৌধুরী মহাশয় প্রকাশ করেন যে, পৌত্রী দানের রাত্রি হইতে একবৎসর সম্পূর্ণ না হইলে, তিনি তাঁহাদের বাটী গমন করিতে বা তাঁহাদের কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না, কারণ ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তিনি পরদিবস আগড়ডাঙ্গায় প্রত্যাগমন করিলে, স্বগ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বহুসংখ্যক ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, চুপীর সম্পত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগত হইয়া, স্বজন-বর্গের এবং গ্রামবাসগণের নিকট গল্প করিতে লাগিলেন,—"চৌধুরী মহাশয় কি পুণ্যবান লোক! মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্মী ইঁহার পিছনে লাগিয়া আছেন! চুপীর বিষয়টা মা লক্ষ্মী যেন হাতে তুলে দান করিলেন।" সন ১২৭১ সালের ১৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবারে তিনি তাঁহার বাটী-সংলগ্ন "শিবপুকুর" নামক পুষ্করিণী একত্রিংশ মুদ্রায় ক্রয়

করেন।* ইহার পর তিনি কোন বিষয় ক্রয় করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর অতিথিসৎকারগুণে নানাদিগ্দেশাগত ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীবৃন্দের পবিত্র চরণস্পর্শে আগড়ডাঙ্গা পল্লী পবিত্রীকৃত হইত। প্রত্যূষে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে সন্ন্যাসিগণের শঙ্খঘণ্টারোলে ও ভজন-গীত ধ্বনিতে আগড়ডাঙ্গা মুখরিত হইত। দুর্গাবাটীর প্রাঙ্গনে, বৈশাখের মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড রৌদ্রে, স্ব স্ব আসনের চতুর্দ্দিকে চারিটী অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, কতিপয় পঞ্চতপাঃ বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় পরমাত্মার ধ্যান-নিমগ্ন। স্থানাভাব বশতঃ দুর্গাবাটীর বহির্দ্দেশে, কয়েকটী সন্ন্যাসী শালগ্রাম, সীতারাম, হনুমানজি এবং গোপাল প্রভৃতি দেবতার পূজায় নিরত। তথায় স্থানাভাব বশতঃ প্রতিবেশিগণের প্রাঙ্গনে কোন সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছেন; কেহ বাল্মীকি রামায়ণ, কেহ তুলসী-দাসী রামায়ণ এবং কেহ হনুমান চল্লিশা পাঠ করিতেছেন। কোন স্থানে জনৈক নানকপন্থী সাধু, মহাত্মা নানকের পবিত্র চরিত্রপাঠ করিতে-ছেন। কেহ পূজাসমাপনান্তে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি কিংবা পবিত্র ভজন-গীত আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ দেবতার ভোগের নিমিত্ত রুটি প্রস্তুত করিতে-ছেন, কেহ রুটি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ঘৃত লেপন করিতেছেন এবং কেহ আতপান্ন রন্ধন করিতেছেন। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী গললগ্নী-কৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে সন্ন্যাসিবৃন্দের সম্মুখে ভ্রমণ করিতেছেন এবং তাঁহার প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যাপেক্ষা কাহারও অধিক খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন আছে কিনা, তাহা অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেহ হস্ত

---

* দুর্গাচরণ চন্দ্র ও শচীনন্দন সেন নামক গন্ধবণিকদ্বয় এই পুষ্করিণী বিক্রয় করিয়াছিলেন। শচীনন্দন সেন, আগড়ডাঙ্গার বাস ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরে বাস করিয়াছিলেন। উঁহার বংশধরগণ জঙ্গীপুরে অদ্যাপিও বাস করিতেছেন।

সঞ্চালন দ্বারা এবং কেহ বাক্যের দ্বারা স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তৎকালে আগড়ডাঙ্গা পল্লী তীর্থস্থল বলিয়া ভ্রম হইত। আনন্দচন্দ্রের জীবদ্দশায় চৌধুরী-গৃহ কখনও সন্ন্যাসি-পদধূলি লাভে বঞ্চিত হয় নাই।

চৌধুরী-বংশের দুর্গোৎসব পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী পরম ভক্তিভাবে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী মা দশভুজা দুর্গার পূজা করিতেন। পূজার চারিদিন যথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইতেন। দেবীর ভোগের পর রাত্রি দুইটা, তিনটা পর্য্যন্ত অন্নদান চলিত। কি নিমন্ত্রিত, কি অনিমন্ত্রিত, সকল ব্যক্তিকেই পরম যত্নের সহিত ভোজন করান হইত। দেবীর ভোগের নিমিত্ত তৎকাল-প্রচলিত বহুসংখ্যক ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত, অধিকন্তু ব্রীহি কলাইয়ের ডাল ও পুষ্করিণী-জাত কচুর শাক রন্ধন করান হইত। চিনি এবং সমস্ত মিষ্টান্ন ময়রা দ্বারা গৃহে প্রস্তুত করান হইত। মোদকগণ কিন্তু কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিত না। দরিদ্রগণের জন্য প্রচুর পরিমাণে মুড়ি ভাজান হইত। প্রতিবেশিনী সদ্গোপ ও গন্ধবণিক রমণীগণ পূজার দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই মুড়ি ভাজিতে আরম্ভ করিত। কিন্তু তাহারাও এই পরিশ্রমের নিমিত্ত বেতন বা পুরস্কার গ্রহণ করিত না, অনেক অনুরোধে কেবল আহার করিত। দুর্গাষষ্ঠীর দিবসে, গ্রামের সমস্ত পূজাবাটীর পুরোহিতগণ একত্রে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তস্থ কালী-পুষ্করিণীতে ঘট পূর্ণ করিতে গমন করিতেন। এই সময় গ্রামের সমস্ত পূজাবাটীর ঢাক, ঢোল, বংশী, কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা একত্রে বাদিত হওয়ায়, দশদিক মুখরিত হইত। পুরোহিতগণ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, স্ব স্ব পূজামণ্ডপে বারিপূর্ণ ঘট স্থাপন করিতেন। এই দিবস কেবল বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের দেবীর সম্মুখে ছাগবলি প্রদত্ত হইত। দুর্গাষষ্ঠী-দিবসে চৌধুরীদের কিংবা অন্য কাহারও দেবীর নিকট কোন বলি প্রদত্ত হইত না। দুর্গাষষ্ঠীর

ন্যায়, সপ্তমী দিবসেও কালী পুষ্করিণী হইতে ঘট পূর্ণ করিয়া আনা হইত। এই দিবস গ্রামের সকল পূজা-বাটীতেই বলিদান হইত। বলিদানের পূর্ব্বে সকলপূজাবাটীর বাদ্যকরগণ স্ব স্ব বাদ্যযন্ত্র লইয়া, চৌধুরীদের পূজা-বাটীতে উপস্থিত হইত। সর্ব্বপ্রথমে চৌধুরীদের দেবীর সম্মুখে বলিদান হইত। তৎপরে সমস্ত বাদ্যকরগণ এবং দর্শকবৃন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়দের পূজা বাটীতে উপস্থিত হইত, তথায় বলিদান হইলে, রায়েদের পূজা বাটীতে উপস্থিত হইত, রায়েদের বলিদান হইলে গন্ধবণিকজাতীয় চঁদদের পূজা-বাটীতে উপস্থিত হইত, তাঁহাদের বলিদানের পর গ্রহাচার্য্যদের পূজা-বাটীতে উপস্থিত হইত, তথায় বলিদান শেষ হইলে কোটালদের বাটীতে উপস্থিত হইত এবং তথায় বলিদান শেষ হইলে আপন আপন বাটী চলিয়া যাইত। গ্রহাচার্য্যদের বলিদান শেষ হইলে, কোটালবাটীর বলিদান দর্শন করিতে যাইবার সময়, দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকে অশ্লীল ভাষায় গান গাহিত ও নৃত্য করিত। মহাষ্টমী পূজায় কেবল বন্দ্যোপাধ্যায়দের দেবীর সম্মুখে বলিদান হইত। চৌধুরীদের বা অন্য কোন বাটীতে মহাষ্টমীতে বলিদান হইত না। সপ্তমী পূজার ন্যায়, সন্ধিপূজার বলিদানও চৌধুরীদের দেবীর নিকট সর্ব্ব প্রথমে হইত। দক্ষিণদিকস্থ কোন গ্রামের বলিদান-বাদ্য শ্রুত হইবামাত্র, চৌধুরীদের দেবীর নিকট একটী সম্পূর্ণ শ্বেত বা সম্পূর্ণ কৃষ্ণ ছাগ বলি প্রদত্ত হইত। দক্ষিণদিকস্থ বলিদান-বাদ্য অতি শীঘ্র শ্রবণ করিবার মানসে, আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী, বৃক্ষোপরে এবং গৃহের চালের উপর লোক রাখিতেন। দক্ষিণের বলিদান-বাদ্য শ্রুত হইবামাত্র তাহারা উপর হইতে চীৎকার করিয়া সংবাদ দিত এবং তৎক্ষণাৎ চৌধুরীদের বলিদান সম্পন্ন হইত। তৎপরে অন্যান্য বাটীতে সপ্তমীপূজার ন্যায় বলিদান সম্পন্ন হইত। সন্ধিপূজার বলিদানের পর

ব্রাহ্মণদিগকে ফলমূলাদি ভোজন করান হইত। নবমী পূজার দিবসেও সর্ব্বপ্রথমে চৌধুরীদের দেবীর সম্মুখে বলিদান হইত এবং তৎপরে সপ্তমীপূজার বলিদানের ন্যায়, অন্যান্য বাটীতে বলিদান হইত। দশমী পূজার দিবসে কেবল বন্দ্যোপাধ্যায়দের দেবীর সম্মুখে বলিদান হইত, কিন্তু চৌধুরীদের কিম্বা অন্য কোন বাটীতে সে দিবস বলিদান হইত না। দেবী-প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর রাত্রে গ্রামদেবী মঙ্গলচণ্ডীর সম্মুখে চৌধুরীদের একটী, বন্দ্যোপাধ্যায়দের একটী এবং চঁদদের একটী কুষ্মাণ্ড বলি প্রদত্ত হইত। দশমীপূজার দিবসে বন্দ্যোপাধ্যায়দের দেবীর নিকট পর্য্যুসিত অন্নের ভোগ প্রদত্ত হইত। বাসি ব্যঞ্জন এবং মসলারহিত বাসি সিদ্ধ মাংস ঐ ভোগের সহিত দেবীকে উৎসর্গ করা হইত। বিজয়া দশমীর দিন বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটীতে গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ বাসি অন্ন-প্রসাদ ভোজন করিতেন এবং রাত্রে আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী তাঁহাদিগকে পরম যত্নে সদ্যোপক্ব অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করাইতেন। বলিদানের নিয়মটী বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই এবং ভক্তির সহিত সকলে পালন করিতেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়দের পূজা, তাঁহাদের দৌহিত্রের উপাধি অনুসারে চট্টোপাধ্যায়দের পূজা বলিয়া কথিত হয়। চট্টোপাধ্যায়দের শেষ বংশধর আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তানাদি না থাকায়, এই পূজাটী উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে। কোটালবংশীয়গণ গ্রামের চৌকিদার ছিল। তাহাদের চৌকিদারী চাকরাণ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার, তাহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের দুর্গাপূজাও উঠিয়া গিয়াছে। পূজার রাত্রে চৌধুরীদের দুর্গামণ্ডপ এবং দুর্গাবাটী প্রভৃতি চতুর্ম্মুখ, অষ্টমুখ এবং ষোড়শমুখ মৃন্ময় প্রদীপে আলোকিত হইত। প্রদীপে সর্ষপ তৈল এবং প্রত্যেক মুখে স্থূল শলিতা প্রদত্ত হইত। কোন কোন প্রদীপ কাষ্ঠনির্ম্মিত উচ্চ প্রদীপদানের উপর স্থাপিত হইত এবং

কোন কোন প্রদীপ গৃহের কড়িকাঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। পূজা-মণ্ডপে দুই একটী মোমবাতি এবং কাচনির্ম্মিত আলোকও জ্বালিত হইত। তৎকালে কেরোসিন-তৈল শোবী বা পুষ্ট আলোক ব্যবহৃত হইত না, কারণ দেশে তখন কেরোসিন তৈলের প্রচলন ছিল না। বিজয়া-দশমীর রাত্রে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণবালক ও ব্রাহ্মণযুবকগণ প্রত্যেক ব্রাহ্মণবাটী গমন করিয়া, পূজনীয় ব্যক্তিদিগকে প্রণাম ও সমবয়স্ক ব্যক্তিগণকে আলিঙ্গন করিতেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রণোপলক্ষে চৌধুরী-বাটী আগমন করিয়া, সমবয়স্ক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে আলিঙ্গন করিতেন। কায়স্থ, গন্ধবণিক, সদ্গোপ এবং অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণ ঐ রাত্রে সমস্ত ব্রাহ্মণবাটী গমন করিয়া, আবালবৃদ্ধ সমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিত। প্রণামালিঙ্গনাদি সমাপনান্তে, ব্রাহ্মণবৃন্দ চৌধুরী-বাটীতে ভোজন করিতেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময়, আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়া, কাহার কোন দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাপ্ত হইলে, কায়স্থ, গন্ধবণিক, সদ্গোপ প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তিগণকে ভোজন করান হইত। সর্ব্বশেষে আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী স্বয়ং ভোজন করিতেন। সে রাত্রে আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর ভোজন করিতে চারিটা বাজিয়া যাইত। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত চৌধুরী বাটীতে উৎসব চলিত এবং তদনন্তর আত্মীয়-কুটুম্বগণ স্বগৃহে গমন করিতেন।

পূর্ব্বপুরুষগণের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধোপলক্ষে, পর্ব্বোপলক্ষে এবং স্ত্রীলোকদিগের ব্রতোপলক্ষে, আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী প্রতিমাসেই ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। ব্রাহ্মণভোজন সমাপনান্তে তদ্দিবস পরম যত্নসহকারে তিনি গ্রামের অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইতেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমিত্ত তৎকাল-প্রচলিত

বহুসংখ্যক ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত, কিন্তু তত্রাচ তিনি ব্রীহি কলাইয়ের ডাল ও পুষ্করিণী-জাত কচু রন্ধন করাইতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক পুষ্করিণী ছিল এবং তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ রোহিত কাতলা প্রভৃতি মৎস্য জন্মিত। ব্রাহ্মণ-ভোজনোপলক্ষে বহুসংখ্যক বৃহৎ মৎস্য ধৃত হইত। ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণকে রোহিত প্রভৃতি বৃহৎ মৎস্যের অখণ্ড মস্তকের ব্যঞ্জন প্রদত্ত হইত। মৎস্য, দধি এবং পায়স ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই প্রভূত পরিমাণে প্রদত্ত হইত। ভোজনকালে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অনেকে বিনা নিমন্ত্রণেও উপস্থিত হইত। তাহাদিগকেও পরম সমাদরে ভোজন করান হইত। দরিদ্রগণ ভোজনান্তে একজনের আহারোপযোগী অন্নব্যঞ্জন বাটী লইয়া যাইত।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর অন্নদান চৌধুরী-বংশের একটী গৌরবের বিষয়। প্রতি দিবস অতিথি-ভোজনের পর আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব, পরিচিত ও অপরিচিত আগন্তুকগণের সহিত তিনি স্বয়ং ভোজন করিতেন। বলা বাহুল্য যে, অপরিচিত ও ব্রাহ্মণেতর আগন্তুকগণের সহিত তিনি কদাচ এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করিতেন না। আহারান্তে প্রতি-বেশিগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অভাব বা অন্য কোন কারণবশতঃ খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে কিম্বা প্রস্তুত করিতে পারে নাই, তাহা অনুসন্ধান করিতেন এবং এরূপ ব্যক্তিগণকে অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিতেন। এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে, ভদ্রব্যক্তিগণ চৌধুরী-বাটীর ভিতরে বসিয়া, পরম সমাদৃত হইয়া ভোজন করিতেন। গ্রামের কাহারও বাটীতে অন্য গ্রামের কোন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি আগমন করিলে, তাহাকে আহার করাইবার নিমিত্ত গ্রামবাসিগণ চৌধুরী-বাটী লইয়া যাইত এবং তথায় সে ব্যক্তিকে পরম সমাদরে ভোজন করান হইত। অপরাহ্ণে আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী, গ্রামের কোন ব্যক্তি অভুক্ত আছে কিনা সন্ধান লইতেন। কেহ কোন

কারণে অভুক্ত থাকিলে তাহাকে বাটীতে আনাইয়া আহার করাইতেন এবং দরিদ্র হইলে তাহাকে চাউল দান করিতেন। আগড়ডাঙ্গা, উচুণ্ডি, আলেপুর প্রভৃতি গ্রামের অনেকের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে ধান্যের অভাব হইত। তাহারা দান গ্রহণ করিতে লজ্জানুভব করিত। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী তৎকালে তাহাদিগকে ধান্য ঋণ দিতেন। তাহারা মাঘমাসে ঐ ধান্য ফেরত দিত এবং অনেকে অভাব বশতঃ ধান্য পরিশোধ করিতে পারিত না।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী তাঁহার মূল্যবান সময়ের অধিকাংশ পরোপকারার্থে ব্যয় করিতেন। গ্রামে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে, তিনি দিবসের মধ্যে অনেকবার রোগীর তত্ত্বাবধান করিতে যাইতেন এবং তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। গ্রামে কাহারও মৃত্যু হইলে, তিনি মৃতদেহ সৎকারার্থ গঙ্গাতীর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার এরূপ একটী ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল যে, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার আদেশ পালন করিত। গঙ্গাতীরে সৎকারার্থ, তিনি কোন ব্যক্তিকে মৃতদেহ বহন করিতে বলিলে, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করিত এবং চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিত। মৃতদেহ অতি শীঘ্র সৎকারার্থ প্রেরিত হইত, কারণ যতক্ষণ না মৃতদেহ গ্রাম হইতে বাহির করা হইত, ততক্ষণ গ্রামের দেবদেবীর পূজা বন্ধ থাকিত। স্বগ্রামে কিম্বা পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে, কোন বৈষয়িক ব্যাপারে বা অন্য কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষই আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীকে মধ্যস্থ মানিত। তাঁহার নিরপেক্ষতাগুণে তিনি যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিতেন, উভয় পক্ষই আনন্দের সহিত তাহাতে সম্মত হইত।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী বিচারালয়ে শপথ করা পাপ মনে

করিতেন। তদ্ধেতু তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কখনও কোন মোকদ্দমা করেন নাই, কিম্বা কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। বৃদ্ধাবস্থায় একবার মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার কাগ্রাম থানার নিকটবর্ত্তী মৌগ্রামের জনৈক কলহপ্রিয় লোক তাঁহাকে সাক্ষী মানায় সাক্ষিগণের তালিকা হইতে তাঁহার নাম বাদ দিবার জন্য তিনি উক্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই। অগত্যা তিনি লুকাইয়া পড়িলেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়, তৎকালে অনিচ্ছুক সাক্ষীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করণার্থ মাল ক্রোকের বিধি ছিল না। উক্ত সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত বিচারালয়ে উপস্থিত করণার্থ বিচারপতি স্থানীয় পুলিসের উপর লিখিত ক্ষমতা প্রদান করিতেন। সহস্রাধিক চৌকিদার সমেত, কেতুগ্রাম থানার তৎকালীন দারগা, একদিন শেষরাত্রে, আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিলেন। কেতুগ্রাম থানার সমস্ত গ্রামের অধিবাসিগণ চৌধুরী মহাশয়কে সম্মান ও ভক্তি করিত। বাটী বেষ্টন করিবামাত্র জনৈক চৌকিদার অপর একজন চৌকিদারের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া চৌধুরী-বাটী প্রবেশ করিল এবং চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তিনি তদীয় পিতা আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীকে সাবধান করিয়া-দিলেন। প্রাতে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী সদর দুয়ার খুলিলে, দারগা তাঁহাকে ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীকে উপস্থিত করিবার জন্য বলিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, চক্ষুপীড়া চিকিৎসা করাইবার নিমিত্ত চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা গিয়াছেন। দারগা বলিলেন যে, চৌধুরী মহাশয় বাটীতে আছেন কিনা জানিবার নিমিত্ত, তিনি বাটীমধ্যস্থ সমস্ত গৃহ অনুসন্ধান করিবেন। বাটীস্থ স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতার হানি না

হয়, তন্নিমিত্ত দারগা তাঁহাদিগকে একটী পৃথক গৃহে রাখিবার নিমিত্ত ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীকে উপদেশ দিলেন। তৎপরে ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে গৃহ তল্লাশ আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী খিড়কি দ্বার দিয়া আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীকে প্রতিবেশী সদ্গোপদিগের গৃহে রাখিয়া আসিলেন। সঙ্গপ্রাথিক চৌকিদারের মধ্যে একজনও এ কার্য্যে বাধা দিল না, কিম্বা এ কথা দারগার নিকট প্রকাশ করিল না। বেলা দুইপ্রহর পর্য্যন্ত দারগা সমস্ত গৃহ তল্লাশ করিয়া চৌধুরী মহাশয়কে দেখিতে না পাইয়া অগত্যা হতাশ অন্তঃকরণে প্রস্থান করিলেন এবং চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা গিয়াছেন বলিয়া বিচারপতিকে সংবাদ দিলেন। অতঃপর চৌধুরী মহাশয়ের বিনা সাক্ষ্যেই বিচারকার্য্য শেষ হইল। চৌধুরী মহাশয়কে আর সাক্ষ্য দিতে হইল না।

রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন। গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে নস্য গ্রহণ করিতেন। ভিতরবাটীস্থ পূর্ব্বদ্বারী গৃহের উচ্চ বারাণ্ডায় উপবেশন করিয়া নস্য গ্রহণ করিতে করিতে, তিনি তাঁহার কৃষিকার্য্যোপযোগী প্রিয় ভৃত্য বাঁশী মুচিকে ডাকিতেন। বাঁশী মুচি চৌধুরী-দের মহুলসে পুষ্করিণীর পাহাড়ে, অন্যান্য মুচিদের সহিত বাস করিত। মহুলসে পুষ্করিণী চৌধুরী বাটী হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূর। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর কণ্ঠধ্বনি এতদূর গম্ভীর ও উচ্চ ছিল যে, তিনি তাঁহার বাটীতে বসিয়া বাঁশী মুচিকে ডাকিলে, বাঁশী মহুলসে পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে শুনিতে পাইত এবং গ্রামের সমস্ত ব্যক্তির কর্ণে ঐ শব্দ পৌঁছিত। একদিন প্রত্যূষে তিনি তাঁহার বাটী হইতে জনৈক প্রতিবেশিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মঙ্গলা, আগুন আছে?" এই শব্দ গ্রামের কাঁদফোলা নামক পূর্ব্ব পাড়ার এক ব্যক্তি শুনিতে পাইয়াছিল। চৌধুরী-বাটী কাঁদ-

খোলা হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূর। অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে, তিনি জনৈক দরিদ্র ডোমের কতিপয় শিশুসন্তানকে প্রাতঃভোজনার্থ মুড়ি দান করিতেন এবং দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিতেন,—"দরিদ্র ডোমের গৃহে এতগুলি শিশু-সন্তান অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, আর কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতুলৈশ্বর্য্য, কিন্তু সন্তানাভাবে তাঁহার বংশরক্ষা হইল না। ভগবানের লীলা ভগবানই বুঝেন।" কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর জনৈক প্রতিবেশী। কাশীনাথ বাবু একাধারে ধনী, বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী প্রাতে নিজের সাংসারিক কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া অপরের কলহ-বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন, পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে, অতিথি-কুটুম্ব প্রভৃতিকে আহার করাইয়া স্বয়ং আহার করিতেন। তিনি প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রে আহার করিতে ভালবাসিতেন। কাষ্ঠনির্ম্মিত, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও উচ্চ পিঁড়িতে উপবেশন পূর্ব্বক, অন্নপাত্রের পার্শ্বে পনের যোলটী প্রস্তরময় পাত্রে ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া তিনি ভোজন করিতেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়, কিঞ্চিৎ কাঁজি ও পান্তাভাত একটী প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন করিয়া ব্যঞ্জনপাত্র সমূহের নিকট রক্ষিত হইত। কারণ, উহা তাঁহার একটী প্রিয় খাদ্য ছিল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, আলবোলার সূক্ষ্ম মুখ হইতে অধিকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করা, তৎকালীন ভদ্রলোকসমূহের একটী প্রথা ছিল। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীরও একটী আলবোলা ছিল। ঐ আলবোলার মস্তকোপরি, একটী মৃন্ময় কল্‌কের উপরস্থ তাম্রনির্ম্মিত আবরণে কয়েকটী রৌপ্যনির্ম্মিত দোলক দুলিত। কিন্তু তিনি স্বয়ং এক মিনিটের অধিককাল ধূমপান করিতেন না। তিনি আহারান্তে দিবানিদ্রার বিরোধী ছিলেন, প্রত্যুত তিনি উহা পাপাচরণ মনে করিতেন। অপরাহ্নে সেনেদের দোকানে

গ্রামের অন্যান্য ভদ্রলোকদের সহিত, রামায়ণ-মহাভারত শ্রবণ করিতেন। জনৈক ভদ্রলোক সুস্বরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ কিম্বা কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিতেন এবং অপর সকলে শ্রবণ করিতেন। শ্রোতৃবৃন্দ কখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, কখন ভাবাবেশে ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, কখন হাস্য করিতেন, কখন লজ্জা প্রকাশ করিতেন এবং কখন বীরত্বের প্রশংসা করিতেন। সেনেরা জাতিতে গন্ধবণিক। এক্ষণে তাঁহারা বাণিজ্যোপলক্ষে আগড়ডাঙ্গার বাস ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী সায়ংকালে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে নিজ বৈঠকখানায় উপবেশন পূর্ব্বক অতিথিবৃন্দের ভজনগীতি শ্রবণ করিতেন, কখন বা আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির সহিত গল্প করিতেন। রাত্রি দুইপ্রহরের সময়, যখন কোন নূতন আগন্তুকের আশ্রয়ার্থ আগমনের সম্ভাবনা থাকিত না, তখন আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী পূর্ব্বাগত আগন্তুক, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতির সহিত ভোজন করিয়া নিদ্রা যাইতেন।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী পদব্রজে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি অনেক পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পবিত্র বৃন্দাবনধামে একগাছি তুলসীমালা ও একটী হরিনামের ঝুলী তিনি অতি ভক্তির সহিত ক্রয় করিয়াছিলেন। তদ্দিবস হইতে মৃত্যু দিবস পর্য্যন্ত তিনি উক্ত মালা ও ঝুলী লইয়া প্রাতে ও সায়ংকালে তারকব্রহ্মনাম জপ করিতেন। তীর্থযাত্রার দিবস হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত বা অনুৎসর্গীকৃত কোনপ্রকার পশুমাংস তিনি ভক্ষণ করেন নাই। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও দরিদ্রভোজন করাইয়াছিলেন। বৃন্দা পুষ্করিণী (বিন্দে পুকুর) ও মণ্ডলপুষ্করিণীর (মড়ল পুকুর) পাহাড়ের মধ্যস্থলে, যে অশ্বত্থবৃক্ষটী দীর্ঘ শাখাপ্রশাখা

বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছে, যে বৃক্ষে গ্রামের রমণীবৃন্দ জ্যৈষ্ঠমাসে জামাই-ষষ্ঠী পূজা করিয়া থাকেন এবং সন্তান হইলে ষষ্ঠী-পূজা করিয়া থাকেন, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষটী আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া শিষ্যসহ আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও দরিদ্র-ভোজন করান হইয়াছিল।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সকলগুলির উল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে দুই একটীর পরিচয় দিব। বৈশাখমাসে গঙ্গাস্নান করিবার মানসে সিউড়ির জনৈক উকিল অনেকগুলি সঙ্গীসহ, শিবিকারোহণে একবার উদ্ধারণপুর (উদ্ধানপুর) যাইতেছিলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় তাঁহারা আগড়-ডাঙ্গায় উপস্থিত হন। বৈশাখের দারুণ মধ্যাহ্ন তপনে তাপিত হইয়া তাঁহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং স্নানাহারের নিমিত্ত স্থানান্বেষণ করিতে থাকেন। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের আহ্বানের নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মা চৌধুরী ও পরেশনাথ শর্ম্মা চৌধুরীকে প্রেরণ করেন। উকিল অনুচরবর্গের সহিত আহূত হইয়া চৌধুরী-বাটীতে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন যে কয়েকজন পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী পূজা-সমাপনান্তে ভজন-গীতি আরম্ভ করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে উকিলটী বুঝিতে পারিলেন যে, অতিথি-সৎকার চৌধুরীবংশের একটী নিত্যকর্ম্ম। ভদ্রলোকটী স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক অনুচরবর্গের সহিত ভোজন করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, চৌধুরী মহাশয় অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছেন। তিনি অতিথিসৎকারে অত্যন্ত প্রীত হইয়া অপরাহ্নে যাত্রা করিবার সময় বলিয়া গেলেন,—"চৌধুরী মহাশয়! যদি কখন সিউড়ি গমন করেন, তাহা হইলে দর্শনদানে সুখী

করিবেন।” চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—“গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময়, অনুচরবর্গের সহিত একদিবস আমার বাটীতে অবস্থিতি করিলে পরম সুখী হইব।” প্রত্যাগমনকালে উকিলটী অন্য পথ দিয়া সিউড়ি গমন করিয়াছিলেন। একটী ভদ্রমহিলা একদিবস শিবিকারোহণে মোরগ্রাম গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে আগড়ডাঙ্গায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। দস্যুভয়ে বাহকেরা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। ভদ্রমহিলাটী কোথায় অবস্থিতি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী এই সংবাদ শ্রবণ করতঃ স্বয়ং শিবিকার নিকট গমন করিয়া মাতৃসম্বোধন পূর্ব্বক ভদ্র-মহিলাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া বাটীস্থ রমণীবৃন্দের সহিত অবস্থিতি করিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং বাহকদিগকে পরম যত্নের সহিত আহার করাইলেন। একদিবস আত্মীয়, স্বজন এবং অতিথিবর্গের মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হইতে বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে আনন্দ-চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ী দেবী ভোজন করিতে যাইতেছেন,—তখন কেবল একজনের উপযোগী অন্নব্যঞ্জন অবশিষ্ট আছে; এমন সময় জনৈক বাঙ্গালী অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ব্রহ্মময়ী দেবী আহার করিতে বসিলেন না। পরম ভক্তির সহিত অতিথিকে ভোজন করাইলেন। স্বয়ং সে দিবস জলাহার করিলেন। আনন্দচন্দ্র স্বীয় পুত্র-পৌত্রাদির নিকট গল্প করিতেন যে,—“দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ। কারণ অর্থসম্পত্তি দান করিয়া কোন ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পারা যায় না। যে ব্যক্তি যত অর্থ-সম্পত্তি পাইবে, তাহার লালসা তত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। কিন্তু যে ব্যক্তিকে অন্নদান করিবে, সে ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, শেষে অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে।” আনন্দচন্দ্র উপদেশ দিতেন যে,—“অতিথি কখনও বিমুখ

করিবে না। যতদিন তোমার অবস্থা ভাল থাকিবে, ততদিন তোমার গৃহে অতিথি আগমন করিবেন, অবস্থা মন্দ হইলে কোন অতিথি আসিবেন না। অবস্থা মন্দ হইলে যদি কোন অতিথি ভ্রমবশতঃ আগমন করেন, তাহা হইলে মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে বলিবে,—'কি করিব মহাশয়! আমার অবস্থা মন্দ, এখন অতিথি-সৎকার আমার সাধ্যাতীত।' অতিথিকে কদাচ কর্কশ বাক্য বলিবে না।" আনন্দচন্দ্র উপদেশ দিতেন যে, "বিদেশে অর্থব্যয় করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে না, বিদেশে পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়া কেবল উপার্জ্জন করিবে এবং অবকাশমত স্বগ্রামে আগমন করতঃ যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া অনাথ আতুরের কষ্ট নিবারণ করিবে এবং স্বদেশের লোককে সুখী করিতে চেষ্টা করিবে।" এক সময় আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী গ্রামের গোমস্তার নিকট তাঁহার কয়েক বিঘা করদভূমির রাজস্ব প্রেরণ করিয়াছিলেন। গোমস্তা রাজস্ব গ্রহণ করিয়া রাজস্ব-বাহককে রসিদ দেন নাই। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী মনে করিলেন যে, রসিদ গোমস্তা স্বয়ং আসিয়া দিয়া যাইবেন। পাঁচ ছয় দিবস পর্যন্ত রসিদ না পাইয়া আনন্দচন্দ্র গোমস্তাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া দেবালয় হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় গোমস্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দচন্দ্র বলিলেন,—"তুমি খাজনা লইয়া রসিদ দাও নাই, এ কিরূপ অন্যায়!" এই কথা শুনিয়া ভয়ে গোমস্তা কাপড়ে নিতান্ত বালকের ন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিল।

আনন্দচন্দ্র বলিলেন,—"ভয়ের কোন কারণ নাই, বেলা অনেক হইয়াছে, স্নানাহার করিয়া বাটী যাও, পরে রসিদ পাঠাইয়া দিবে।" গোমস্তা চৌধুরী বাটীতে আহার করিয়া বাটী গমন করিল এবং পরদিবস প্রাতে স্বয়ং চৌধুরী-বাটী আসিয়া খাজনার রসিদ দিয়া গেল।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী শ্যামাচরণ রায়ের পিতা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়কে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিনি অনেক স্থানে স্বয়ং জামিন থাকিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের চাকরি যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ও আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের সন্তানেরা সর্ব্বদাই চৌধুরী-বাটীতে খেলা করিত এবং তথায় প্রায়ই আহার করিত এবং আনন্দচন্দ্র চৌধুরীর পৌত্রগণও অনেক সময় কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের বাটীতে খেলা করিত ও কখন কখন তথায় আহার করিত। এই দুইটী বংশের মধ্যে যে রক্তের সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। কিন্তু কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্যামাচরণ রায়ের সময় এই দুই বংশের এতদূর শত্রুতা জন্মিয়াছিল যে, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লেখক তাহা বর্ণনা করিতে একান্ত অসমর্থ। এরূপ পরিবর্ত্তনের হেতু যথাস্থানে লিখিত হইবে।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর বেশভূষা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত ছিল। তিনি মস্তকের চতুর্দ্দিকে নিম্ন অংশে অল্পমাত্র চুল কর্ত্তন করিতেন, অবশিষ্ট চুল মস্তকের উপর স্ত্রীলোকের কেশের মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত এবং তিনি তাহা শিখাবন্ধনের ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিতেন। এরূপ শিখাবন্ধন তৎকালীন ব্রাহ্মণ-সমাজের একটী প্রথা ছিল। গাত্রাবরণের মধ্যে কেবল শীতকালে বালাপোষ গায়ে দিতেন এবং গ্রীষ্মকালে কেবল স্কন্ধে একটী চাদর ব্যবহার করিতেন। চর্ম্মপাদুকার মধ্যে চটি জুতাই ব্যবহার করিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণার্থ বংশ ও সুপারিপত্র নির্ম্মিত ছত্র ব্যবহার করিতেন। ভিন্ন গ্রামে গমন করিতে হইলে একটী বংশ-যষ্টি হস্তে রাখিতেন। তৎকালীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মত নস্য ব্যবহার করিতেন। তাঁহার যজ্ঞোপবীত স্থূল ছিল। তাঁহার আহার, শয়ন প্রভৃতিও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের ন্যায় ছিল।

এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুণ্যকর্ম্মা মহাপ্রাণ আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরি মহাশয়ের মৃত্যুকালীন ইতিবৃত্ত অতি আশ্চর্য্যজনক। পুরাণ আদি-বর্ণিত 'ইচ্ছামৃত্যু' যে নিছক কবি-কল্পনা নহে, তাহা এই পুণ্যাত্মার শেষ জীবন-ঘটনা হইতে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়।

সে এক শুক্লাশ্বিনের প্রতিপদ। দুর্গোৎসবের আর চারিদিন মাত্র বিলম্ব আছে। চৌধুরী-বাটীতে দুর্গোৎসরের সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। চিত্রকরগণ দেবী-প্রতিমা চিত্রিত করিতেছে। বালক-বালিকাগণ দলে দলে চৌধুরী-বাটীতে প্রতিমা দর্শন করিতে আসিতেছে। চৌধুরীদের বৈঠকখানায়-উপবিষ্ট ভদ্রলোকগণের মধ্যে কেহ পঞ্জিকা পাঠ করিয়া, কোন্ সময় সন্ধিপূজা হইবে, তাহা সকলকে জানাইতেছেন; কেহ বলিতেছেন, "এ বৎসর সন্ধিপূজার সময় ভুল হইতে দিব না, আমি স্বয়ং চালে উঠিয়া দক্ষিণের বাদ্য শ্রবণ করিব," এবং কেহ বলিতেছেন, "এ বৎসর এক প্রহর রাত্রি থাকিতে পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে আরম্ভ করিব।" এমন সময় আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী তদীয় তনয় ত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মা চৌধুরী ও পরেশনাথ শর্ম্মা চৌধুরীকে বলিলেন,—"কল্য প্রত্যূষে আমি সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করিব।" শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনবার্ত্তার ন্যায়, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিমর্ষ হইলেন। তিনি কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন,— "দেখ পরেশ! তোমার একটী মাত্র কন্যা, যদি তোমার পুত্র না জন্মে, তাহা হইলে তুমি যে সম্পত্তি পাইবে, তাহার দশ আনা অংশ ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র রাধিকাকে দিবে এবং অবশিষ্ট ছয় আনা তোমার কন্যা গোলাপকে দিবে।" পরেশচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী বলিলেন— "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আমি তাহাই করিব।" পরদিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই চৌধুরী-বাটী লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। আনন্দচন্দ্র জগন্মাতা দুর্গার প্রতিমা-সম্মুখে ও কুলদেবতা শালগ্রাম-সম্মুখে

ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিলেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিল, কেবল পুরোহিত-বংশীয় কাহাকেও পদধূলি গ্রহণ করিতে দিলেন না। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে, আনন্দচন্দ্র যথোচিত উপদেশ দিলেন। সূর্য্যোদয়ের পরে বারবেলা হইবে তন্নিমিত্ত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আনন্দচন্দ্র জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া, উচ্চকণ্ঠে দুর্গানাম করিতে করিতে, শিবিকারোহণে সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করিলেন। গ্রামের মধ্যস্থলে "মঙ্গলচণ্ডী-তলায়" শিবিকা উপস্থিত হইলে, আনন্দচন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া ভক্তিভরে মঙ্গলচণ্ডীদেবীকে প্রণিপাত করিলেন। তথায় গ্রামের মুসলমানগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। চৌধুরী একরাম আলি সাহেবের পিতা চৌধুরী মছিয়র রহমান সাহেব বলিলেন,—"আপনি গ্রাম অন্ধকার করিয়া চলিলেন," এই বলিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শিবিকা গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে "শিবতলায়" উপস্থিত হইলে, আনন্দচন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। গ্রামবাসিগণ খোল করতাল বাজাইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শিবিকা সহ দক্ষপড়েড গ্রামের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিল। তথায় তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিল তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী, কনিষ্ঠপুত্র পরেশনাথ চৌধুরী, আত্মীয় রামনাথ সরকার, পুরোহিত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রতিবেশী দুর্গাচরণ ঘোষ ও গৌর ঘোষ প্রভৃতি। যথাসময়ে আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী পুণ্যতোয়া ভাগীরথি-তীরবর্ত্তী নলিপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার দিন গঙ্গাবাস করিয়া, চতুর্থীর দিন প্রাতে আনন্দচন্দ্র তাঁহাকে গঙ্গাতটে লইয়া যাইবার জন্য পুত্রদ্বয়কে আদেশ করিলেন। গঙ্গাতটে আনীত হইলে তিনি পবিত্র তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলেন। নলিপুরে পতিতপাবনী জাহ্নবী

তটে, তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে করিতে পুণ্যাত্মা আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর জীবন-দীপ চির নির্ব্বাপিত হইল। পুত্রদ্বয় পবিত্র-সলিলা গঙ্গাতটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিয়া সঙ্গীগণসহ বাটী প্রত্যাগত হইলেন। দুর্গোৎসব পূর্ব্বের ন্যায় সমারোহেই সম্পন্ন হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাঁহার শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত এখনও ঐ দিবসে তাঁহার সাংবাৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। যে দিন মহাত্মা আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী মানবলীলা সংবরণ করিলেন, সেইদিন হইতে চৌধুরী-বংশের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইতে আরম্ভ হইল।

ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী
এবং
পরেশনাথ চৌধুরী।

আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মা চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ পরেশনাথ শর্ম্মা চৌধুরী। ইঁহারা নামের পরে শর্ম্মা চৌধুরী না লিখিয়া, চৌধুরী লিখিতে আরম্ভ করেন। কখন কখন শর্ম্মা চৌধুরীও লিখিতেন। তবে অধিকাংশ সময়, নামের পরে কেবল চৌধুরী বলিতেন ও লিখিতেন। সেইজন্য আমরা কেবল চৌধুরী লিখিব। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর শ্রীপাদপদ্মদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমার জন্মের পূর্ব্বেই পরেশনাথ চৌধুরী স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে আমি আমার পিতামহ ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর নিকট আমাদের বংশের, আমাদের গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ইতিহাস শ্রবণ করিতাম। পার্শিভাষায় লিখিত আমাদের পুরাতন কাগজ-পত্র খাঁড়েরা মধ্যবাঙ্গালা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং আমার শুভানুধ্যায়ী পণ্ডিত মৌলবী হসরৎ উল্লা খাঁ সাহেবের দ্বারা অনুবাদ করাইয়া তাঁহার নিকট পাঠ করিতাম। তিনি পুরাতন কথা বলিতে বড় ভাল-বাসিতেন এবং উহা শুনিতে আমিও অত্যন্ত আনন্দানুভব করিতাম। বিদ্যানুশীলনের সময় নষ্ট হইবে মনে করিয়া, আমার পিতা পূজ্য-পাদ তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী সময় সময় আমার ইতিহাস শ্রবণে বাধা দিতেন।

পূজনীয় শ্রীরাম রায়, শূর্যা গরাঁয়ের পিতামহ, মাখন ঘোষের পিতা দুর্গাচরণ ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র স্বর্ণকার, হরিশ্চন্দ্র আচার্য্য-সিদ্ধান্ত, গোপালচন্দ্র প্রমাণিকের পিতামহী এবং শিবদাস দাসের (তন্তুবায়) পিতামহী প্রভৃতি প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট অনেক পুরাতন গল্প শুনিয়াছি। ইঁহারা সকলেই এক্ষণে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সকলের স্মরণ-পথ হইতেও অন্তর্হিত হইতে চলিলেন। আমি বাল্যে ও যৌবনের প্রারম্ভে, সমবয়স্ক বালকগণের সহিত খেলা করিতে ভালবাসিতাম না। উল্লিখিত প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট বসিয়া তাঁহাদের গল্প শুনিতে অত্যন্ত আনন্দানুভব করিতাম। তন্নিমিত্ত গ্রামের যুবক ও প্রৌঢ়গণ আমার নিন্দা করিয়া বলিতেন,—"এ ছেলের আর লেখাপড়া হইবে না, কারণ অত্যন্ত বুড় হইয়া পড়িয়াছে।" এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, উক্ত প্রাচীনগণ আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন এবং আমি তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী।

ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী সন ১২৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সন

১৩১০ সালে, ইংরাজি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দুর্গোৎসবের পর এয়োদশী তিথিতে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

ত্রৈলোক্যনাথ পিতামাতার অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবন বড় সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। গৃহে পিতামাতার আদর; গ্রামে মাতুলালয়—তথায় মাতামহ, মাতামহীর আদর; এবং সম্মানিত লোকের সন্তান বলিয়া, গ্রামের সকলের আদর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বাল্যে এরূপ আদর পাইলে, যেরূপ কুফল হয়, ত্রৈলোক্যনাথের জীবনে তাহাই হইল। তিনি বিদ্যানুশীলনে অমনোযোগী হইলেন। পিতার যথেষ্ট যত্নসত্ত্বেও উপযুক্ত বিদ্যালাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না।

ত্রৈলোক্যনাথের অবয়ব সুবদ্ধ, দৃঢ়ীকৃত ও উন্নত, বক্ষঃ প্রশস্ত, ললাট উন্নত, মুখমণ্ডল ঔদার্যব্যঞ্জক এবং সাহসপূর্ণ। তিনি বাল্যে হাডু-গুডু, ডাং-গুলি প্রভৃতি ব্যায়ামজনক ক্রীড়া ভালবাসিতেন। জীবনে কখনও তাস, দাবা প্রভৃতি আলস্য-জনক ক্রীড়া শিক্ষা করেন নাই।

ত্রৈলোক্যনাথের পিতা, স্বর্ণময়ী নাম্নী একটী পরমা সুন্দরী পঞ্চ-বর্ষবয়স্কা কন্যার সহিত ত্রৈলোক্যনাথের বিবাহ দিলেন। স্বর্ণময়ীর পিত্রালয় আগড়ডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী আইজুনি গ্রাম। তাঁহার পিতা ঐ গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্রাহ্মণ। একদিবস আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী কোন কার্য্যোপলক্ষে আইজুনি গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়, কন্যার পিতা কন্যাটীকে আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর সম্মুখে আনিয়া বলি-লেন,—"চৌধুরী মহাশয়কে প্রণাম কর।" কন্যাটী প্রণাম করিল। কন্যার বয়ঃক্রম তখন পাঁচ বৎসরের অনধিক। আনন্দচন্দ্র কন্যাটীকে অনিমেষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন,—"এই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না কন্যা পরমসুখে জীবন অতিবাহিত করিবে।" কন্যার পিতা কহিলেন,—"আমার প্রার্থনা যে, আপনি এই কন্যাটীকে

অন্নদান করিবেন।" আনন্দচন্দ্র কহিলেন,—"অন্নদানের কর্ত্তা ভগবান, মনুষ্য নহে।" কন্যার পিতা কহিলেন—"আমার একান্ত বাসনা যে, ত্রৈলোক্যনাথের সহিত আমার কন্যাটীর বিবাহ দেন।" আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কন্যাটী পঞ্চবর্ষে পদার্পণ করিলে, তাহার সহিত পুত্র ত্রৈলোক্যনাথের বিবাহ দিলেন।

কালক্রমে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী পৌত্র তিনটীর নাম রাখিলেন,—তারিণীপ্রসাদ, সারদাপ্রসাদ এবং রাধিকাপ্রসাদ। সারদাপ্রসাদের একটী কাণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল, শ্রবণ-শক্তি ভাল ছিল না, তজ্জন্য সে পিতামহ ও পিতামাতার বড় স্নেহের পাত্র ছিল।

আগড়ডাঙ্গার নীলকণ্ঠ রায়ের কন্যা বিশ্বেশ্বরী দেবীর সহিত, আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পরেশনাথ চৌধুরীর বিবাহ দিয়াছিলেন। যথাসময়ে পরেশনাথের একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী পৌত্রীর নাম রাখিলেন—গোলাপসুন্দরী এবং নিয়মিত সময়ে দাঁইহাট-নিবাসী বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত গোলাপসুন্দরীর বিবাহ দিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী ও পরেশনাথ চৌধুরীর আর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর পরলোক গমনের পর, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পরেশনাথ চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী বিশ্বেশ্বরী দেবী ইহধাম পরিত্যাগ করেন। প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করিলে, পরেশনাথ চৌধুরী আটকুলা গ্রামে চন্দ্রাবলী নাম্নী একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে চন্দ্রাবলী দেবীর সহিত ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর পত্নীর মনোমালিন্য ঘটিল। ফলতঃ সন ১২৭৯ সালে দুই ভ্রাতায় পৃথক হইলেন। অতি প্রাচীন পূর্ব্বদ্বারী গৃহটী ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর অংশে পতিত হইল;

এই গৃহটী দুইটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী চিরন্তন প্রথানুযায়ী সাংসারিক কার্য্যে ব্যবহার করিতেন এবং উত্তরদিকের প্রকোষ্ঠে সাংসারিক কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদি থাকিত এবং একটী ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি কুলদেবতা "রণরাম" নামক শালগ্রাম শিলা স্থাপিত ছিলেন। উভয় ভ্রাতার পত্নীদের মধ্যে সদ্ভাব না থাকায়, তাঁহারা একটী পূজা-মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই মন্দিরে এক্ষণে ৺রণরাম অবস্থিতি করিতেছেন। পরেশনাথ চৌধুরীর দ্বিতীয়া পত্নীর কোন সন্তান জন্মে নাই। তিনি কোন কঠিন পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর, পরেশনাথ চৌধুরী আর দারপরিগ্রহ করেন নাই।

পরেশনাথ চৌধুরী তৎকাল প্রচলিত বিদ্যানুশীলনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। সময় সময় চাকরি করিতেন। অধিকাংশ সময়, স্বীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে এবং মধ্যস্থ মানিত হইয়া, অপরের বিবাদ ভঞ্জনে লিপ্ত থাকিতেন। পরেশনাথ চৌধুরীর শরীর উন্নত, স্থূল, বলিষ্ঠ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এবং ললাট উন্নত ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু পরেশনাথ চৌধুরী যথেষ্ট পরিশ্রমী ছিলেন। পরেশনাথ চৌধুরীর পরোপকারিতা এবং আরও কতকগুলি মহৎ গুণের জন্য গ্রামস্থ সকলেই তাঁহার বশীভূত ছিল।

সন ১২৮৫ সালের বিজয়া-দশমীর দিন, চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ বৈঠকখানায় বসিয়া, গ্রহাচার্য্য সর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত, সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদায়িনী, জগজ্জননী দুর্গাকে আগামী বৎসরের পঞ্জিকা শ্রবণ করাইতেছেন। আত্মীয়-স্বজন, প্রজা, প্রতিবেশী এবং বন্ধুগণসহ ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী ও পরেশনাথ চৌধুরী পঞ্জিকা শ্রবণ করিতেছেন। সর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত পাঠ করিলেন,—"আগামী ১৮০১ শকাব্দায় অর্থাৎ সন ১২৮৬ সালে

কার্ত্তিকমাসে দুর্গাপূজা হইবে। ৪ঠা কার্ত্তিক, সোমবার, ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ, ৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার সপ্তমী-পূজা, দেবীর ঘোটকে আগমন, ৬ই কার্ত্তিক বুধবার অষ্টমী-পূজা, রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে সন্ধি-পূজা আরম্ভ, ৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার নবমী-পূজা এবং ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার দশমী-পূজা, দেবী দোলায় গমন করিবেন।" পঞ্জিকা শ্রবণ করিয়া, আগামী বৎসর সুবৎসর কি দুর্ব্বৎসর হইবে, সকলে তর্ক করিতে লাগিলেন। পরেশনাথ চৌধুরী বলিলেন,—"আগামী বৎসর পূজাদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিবে না। বৃথা তর্কে প্রয়োজন কি।" এ কথার উদ্দেশ্য তৎকালে কেহ বুঝিতে পারে নাই।

সন ১২৮৬ সালের আশ্বিন মাসের শেষভাগে পরেশনাথ চৌধুরীর পীড়া হইল। পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ২৮শে আশ্বিন গঙ্গা-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় * বলিলেন,—"তোমার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তোমার বিষয়ের কি বন্দোবস্ত করিবে?" পরেশনাথ চৌধুরী উত্তর করিলেন,—"আমার বিষয়ের দশ আনা অংশ রাধিকা পাইবে এবং ছয় আনা অংশ গোলাপ পাইবে।" †

সন ১২৮৬ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক, সোমবার, দুর্গাষষ্ঠী, আগড়ডাঙ্গা চৌধুরী-বংশের একটী স্মরণীয় দিন। এই দিনটী চৌধুরী-বংশধরগণ কোনরূপেই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। চৌধুরী-বংশের এই দিবসের ঘটনার ন্যায় কোন একটী ঘটনা, যখনই চৌধুরী বংশধরগণ স্বগ্রামে,

* গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা এবং কমলাকান্ত ও রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ। ইনি মধুসূদন রায়ের ভগ্নীপতি। ইঁহার পিত্রালয়—মালগ্রাম। আগড়ডাঙ্গায় শ্বশুরালয়ে বাস করিয়াছিলেন।

† রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর পুত্র। গোলাপসুন্দরী দেবী পরেশনাথ চৌধুরীর কন্যা।

স্বদেশে বা বিদেশে দর্শন করিবে, তখনই সন ১২৮৬ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক, সোমবার, দুর্গাষষ্ঠী তাহাদের মনোমধ্যে জাগরিত হইবে। স্বগ্রামের যে সকল ব্যক্তি এই দিবসের ঘটনায় চৌধুরীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে এইরূপ ঘটনা ঘটিলে, চৌধুরী-বংশীয়গণ কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে। ঐ দিবসের ঘটনায় যাহারা আনন্দানুভব করিয়াছিল এবং চৌধুরীদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে ঐরূপ ঘটনা ঘটিলে, চৌধুরীবংশধরগণ মনে মনে বলিবে,—"পাতা ঝরে, কলি হাসে। পাতা বলে, থাক্ কলি, তোর একদিন আছে।" এক্ষণে চৌধুরী-গৃহে নানা দিগ্দেশাগত অতিথিবৃন্দ পূর্ব্বের ন্যায় পদধূলি প্রদান করেন না। এক্ষণে চৌধুরীদের দুর্গোৎসবে পূর্ব্বের ন্যায় সমারোহ হয় না। এক্ষণে চৌধুরী-গৃহে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রাদ্ধ-শান্তি, বৃক্ষ-পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা পরিদৃষ্ট হয় না। এক্ষণে চৌধুরী-বংশীয়গণকে পূর্ব্বের ন্যায় আপন বৈঠকখানায় বসিয়া, গ্রামের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে চৌধুরী-বংশীয়গণ জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত বারমাস বিদেশে অবস্থিতি করেন। এক্ষণে চৌধুরী-বংশে পূর্ব্বের ন্যায় দীর্ঘকায়, বিশাল-বক্ষঃ, বলবান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন না। এক্ষণে চৌধুরীবংশীয়গণের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ, পূর্ব্বের ন্যায় হাস্য, পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়াকৌতুক, পূর্ব্বের ন্যায় অপত্য-স্নেহ এবং পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ পরিদৃষ্ট হয় না। এক্ষণে চৌধুরী-বংশধরগণের দারুণ চিন্তায়, অকালে কেশ শুক্ল হইতেছে এবং তাঁহারা অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতেছেন। এই সকল বিষম পরিবর্ত্তনের কারণ,—সন ১২৮৬ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক, সোমবার, দুর্গাষষ্ঠী-দিবসের একটী শোচনীয় ঘটনা। শ্যামাচরণ রায়ের সহিত চৌধুরীদের যে ভীষণ শত্রুতা পরিলক্ষিত হইত; কৃষ্ণধন

রায় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত চৌধুরীদের যে মনোমালিন্য দৃষ্ট হইত; সেই শত্রুতা ও সেই মনোমালিন্যের সূত্রপাত, সন ১২৮৬ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক, সোমবার, দুর্গাষষ্ঠী-দিবসের সেই শোচনীয় ঘটনা হইতে।

সন ১২৮৬ সালের কথা। সেদিন ৪ঠা কার্ত্তিক, সোমবার, দুর্গাষষ্ঠী। দেবী-প্রতিমা দর্শন-মানসে, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা চৌধুরীদের চণ্ডিমণ্ডপ-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছেন। এই আনন্দময়ী দেবীপ্রতিমা, প্রতিবৎসর শরৎকালে, চৌধুরীগৃহ আনন্দে পূর্ণ করিয়া থাকেন। এ বৎসরও সেই আনন্দময়ী দেবী-প্রতিমা চৌধুরীদের চণ্ডিমণ্ডপে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু চৌধুরীগৃহ নিরানন্দময়। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে পরেশনাথ চৌধুরীর পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। চিকিৎসার নিমিত্ত, কলিকাতা মেডিকেল কলেজোত্তীর্ণ এল,এম,এস, ডাক্তার গঙ্গাটিকুরী-নিবাসী সূর্য্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনিবার নিমিত্ত লোক গিয়াছে। ডাক্তার সূর্য্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকিল, "পাঁচুঠাকুর," "ক্ষুদিরাম" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদর। তিনি বর্দ্ধমানে ডাক্তারি করিতেন। দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাটী আসিয়াছেন।

বেলা দেড় প্রহরের সময়, ডাক্তার সূর্য্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পরেশনাথ চৌধুরীর কণ্ঠরোধ হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয় একটী বাহু বিদ্ধ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। রোগী বাহু ভেদ-যন্ত্রণায় শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আর কথা বলিতে পারিল না। ডাক্তার মহাশয় প্রস্থান করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার বাটীতে দুর্গোৎসব, এক দণ্ড বিলম্ব করিলে চলিবে না, শীঘ্র শিবিকা-বাহকগণকে উপস্থিত হইতে বলুন।" অনতিবিলম্বে শিবিকা-বাহকগণ উপস্থিত হইল। ডাক্তারমহাশয় ষোড়শ মুদ্রা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার মহাশয় প্রস্থান করিবার পনের মিনিট পরে, পরেশনাথ শর্ম্মা চৌধুরী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন বেলা দুই প্রহর।

পরেশনাথ শর্ম্মা চৌধুরীর পরলোক-গমন সময়, তাঁহার একমাত্র কন্যা গোলাপসুন্দরী দেবী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী তাঁহাকে মুখাগ্নি প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে চৌধুরীদের সহিত গোলাপসুন্দরী দেবীর স্বামী, দাঁইহাট নিবাসী বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাদের সূত্রপাত হয়। শ্যামাচরণ রায়ের সহিত চৌধুরীদের ভীষণ শত্রুতার এবং কৃষ্ণধন রায় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত চৌধুরীদের মনোমালিন্যের বীজ এই সময়েই উপ্ত হইয়াছিল।

পরেশনাথ চৌধুরীর শ্রাদ্ধ শেষ হইলে, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী, তাঁহার প্রদত্ত দশ আনা সম্পত্তি পাইবার মানসে, বর্দ্ধমানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী, একদিন রাত্রে গোপনে ——রায় ও ——রায়ের পরামর্শ শুনিয়াছিলেন। পরামর্শটি নিম্নে লিখিত হইল। ——রায়, ——রায়কে বলিলেন,—"দেখুন দাদা! গ্রামের সব শালাই বলে যে, 'চৌধুরীদের জমিতে পা না দিয়া, গ্রাম ঢুকিবার উপায় নাই; চৌধুরীদের অন্নদানের ঘর; চৌধুরীদের অতিথিসেবা আছে; চৌধুরীরা গ্রামের বনিয়াদি লোক; চৌধুরীদের ন্যায় দয়ালু, গ্রামের কোন বংশেই দেখা যায় না।' দেখুন, এই সমস্ত কথা শুনিয়া, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রাগে জ্বলিয়া উঠে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রামশঙ্কর রায় ৩৬০ গ্রামের ইজারাদার ছিলেন, বড় পুকুর ও বামনা নামক দুইটী বৃহৎ পুষ্করণী খনন করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, দালান তৈয়ার করিয়াছিলেন, পাকা চণ্ডিমণ্ডপ ও শিবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং আরও কত পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রামের কোন শালা

একবারও রামশঙ্কর রায়ের নাম করে না এবং রায় বংশের প্রশংসা করে না। এক্ষণে বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, পরেশনাথ চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কন্যা গোলাপ যাহাতে পরেশনাথ চৌধুরীর সমস্ত বিষয় পায় এবং রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী যাহাতে ঐ বিষয়ের কিছুমাত্র অংশ না পায়, তাহাই করিতে হইবে। পরেশনাথ চৌধুরীর বিষয় গোলাপ পাইলে, চৌধুরীরা অর্থাভাবে অতিথিসেবা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইবে, অন্নদান বন্ধ করিবে, পূর্ব্বের ন্যায় সমারোহে দুর্গোৎসব করিতে পারিবে না, গাছ-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন সৎকার্য্যই করিতে পারিবে না। এই সমস্তই সৎকার্য্য বন্ধ করিলে, কোন লোকেই আর চৌধুরীদের প্রশংসা করিয়া, আমাদিগকে মনোকষ্ট দিবে না। আর দাদা! আপনি ত জানেন যে, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী ভয়ানক অহঙ্কারী, তাতে আবার পরেশনাথ চৌধুরীর বিষয়ের দশ আনা অংশ পাইলে, সে ধরাকে শরা জ্ঞান করিবে। আর বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের * মন কত উচ্চ, তা ত আপনি সব জানেন। তাহার সহিত যখনই আমাদের কাটয়ায় বা দাঁইহাটে দেখা হয়, তখনই কত খরচ করিয়া আমাদের যত্ন করিয়া থাকে, তা ছাড়া সতীশকে † খোরাক পোষাক দিয়া নিজের বাসনের দোকানে রাখিয়া, বাসনের খাতা-পত্র শিখাইতেছে।" ——রায় স্বভাবতঃ ক্রোধী ছিলেন, সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। এক্ষণে —— রায়ের উত্তেজনাপূর্ণ পরামর্শ শুনিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্রোধভরে বলিলেন,—"গোলাপ যাহাতে সমস্ত সম্পত্তি পায় এবং রাধিকা এক কাণাকড়িও না পায়, তাহাই করিব।"

---

* বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গোলাপসুন্দরী দেবীর স্বামী।

† সতীশচন্দ্র রায় কৃষ্ণধন রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

পরেশনাথ চৌধুরীর বাটীর প্রাঙ্গণের দক্ষিণপ্রান্তে একটী পেয়ারা গাছ ছিল। উল্লিখিত ঘটনার কয়েকদিন পরে, কৃষ্ণধন রায়ের পুত্র যোগীন্দ্রনাথ রায়, একদিন উক্ত পেয়ারা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পক্ক, অর্দ্ধপক্ক সমস্ত পেয়ারা পাড়িয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর মাতা বলিলেন, "হাঁরে যোগীন্দ্র! বাড়ীর গাছের পেয়ারাগুলি সব পেড়ে নষ্ট ক'রে দিলি, শালগ্রামের সেবার জন্য পেয়ারা রাখিয়াছিলাম, সেই পেয়ারা এমন করে নষ্ট ক'রতে হয়?"

যোগীন্দ্রনাথ রায় পেয়ারা লইয়া বাড়ী গিয়া, এই সমস্ত কথা তাঁহার মাতাকে বলিলেন। তাঁহার মাতা এই সমস্ত কথা শুনিয়া, ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কয়েকদিন পর, দাঁইহাট হইতে বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আগড়ডাঙ্গা আসিলে, তাঁহাকে এই সমস্ত কথা বলিলেন। বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিলেন যে, কৃষ্ণধন রায়কে হস্তগত করিতে না পারিলে, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর সহিত মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব কৃষ্ণধন রায়কে সন্তুষ্ট করিবার মানসে, তিনি স্বহস্তে কুঠার লইয়া, ফলবান পেয়ারা বৃক্ষটীকে ছেদন করিলেন। গাছে তখন তিন শতের অধিক অপক্ক ফল ছিল। গ্রামের অধিকাংশ লোক কর্ত্তিত বৃক্ষটী দেখিতে আসিল এবং কৈলাস মণ্ডল * নামক স্পষ্টবাদী এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে বলিল,—"বাঁড়ুজ্যে মহাশয়! এ পাপের ফলভোগ করিতে হইবে।"

পিতার আদেশে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী, গোলাপসুন্দরী দেবীর সহিত মোকদ্দমাটী আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিলেন। গোলাপসুন্দরী দেবী পরেশনাথ চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কেবল

---

* কৈলাস মণ্ডল—তারক মণ্ডল ও খোকন মণ্ডলের পিতা। জাতি চালতি শুঁড়ি।

দেবোত্তর সম্পত্তির অংশ পাইলেন না। চৌধুরী-বংশের মধ্যে যে ব্যক্তি আগড়ডাঙ্গায় বাস করিবেন, তিনি দেবোত্তর সম্পত্তির রাজস্ব প্রভৃতি আদায় করিয়া, দুর্গোৎসব ও শালগ্রাম সেবা চালাইবেন; এবং দুই বা ততোধিক অংশীদার আগড়ডাঙ্গায় বাস করিলে, প্রত্যেক এক এক বৎসর রাজস্ব প্রভৃতি আদায় করিয়া পূজা চালাইবেন, কিন্তু দেবোত্তর সম্পত্তি বিভাগ হইবে না,—ইহাই চৌধুরী-বংশের চিরন্তন প্রথা।

দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে দুর্গোৎসব ও শালগ্রাম সেবার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। দেবোত্তরের আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় চৌধুরী-বংশধরগণকে বহন করিতে হয়। অতিথি-সেবা, পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধ, লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কোন সম্পত্তি নাই, এ সমস্ত ব্যয় চৌধুরী-বংশধরগণকে বহন করিতে হয়। বাটীতে আত্মীয়-স্বজন, কিম্বা কোন রাজকর্ম্মচারী আগমন করিলে, তাঁহাদের আহারের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ কোন সম্পত্তি নাই, সুতরাং এ সকল ব্যয় চৌধুরী-বংশধরগণকে বহন করিতে হয়। মুষ্টি-ভিক্ষার এবং দরিদ্র পিতামাতৃহীনগণের শ্রাদ্ধের ভিক্ষার কোন সম্পত্তি নাই, সুতরাং চৌধুরী-বংশধরগণকে এ সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হয়। পরেশনাথ চৌধুরীর জীবদ্দশায় উল্লিখিত ব্যয়ভারের অর্দ্ধেক তিনি বহন করিতেন এবং অর্দ্ধেক ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী বহন করিতেন। পরেশনাথ চৌধুরীর পরলোক-গমনের পর, তাঁহার কন্যা গোলাপসুন্দরী দেবী, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যয়সমূহের কিছুমাত্র অংশ গ্রহণ করিতেন না। কারণ তিনি সর্ব্বদাই দাঁইহাটে স্বামী-গৃহে অবস্থিতি করিতেন।

উল্লিখিত কারণে, ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতে লাগিল। তিনি বলিতেন,—"আমার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি আমি কি করিয়া লোপ করিব? চৌধুরী-বংশের পুণ্যকীর্ত্তি লোপপ্রাপ্ত হইলে,

পরেশ চৌধুরীর জামাতা বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কষ্ট হইবে না, কেননা, এ সমস্ত তাহার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি নহে; কিন্তু আমার পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি, আমার সম্মুখে লোপপ্রাপ্ত হইলে, মনোকষ্টে আমার মৃত্যু হইবে।" ক্রমশঃ ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী ঋণ ভারে ভারাক্রান্ত হইতে লাগিলেন; এবং শেষে ঋণ-দায়ে প্রায় সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের দুর্গোৎসব ও শালগ্রাম সেবা এখনও চলিয়া আসিতেছে। তবে অর্থাভাবে, হৃদয়-বিদারক মনোবেদনার সহিত তিনি অতিথি-সেবা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত দারুণ মর্ম্মবেদনার সহিত চৌধুরী বংশধরগণ সন ১২৮৬ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক, সোমবার, দুর্গা-ষষ্ঠীর দিনকে স্মরণ করিয়া থাকে। এই দিবসের দুর্ঘটনা না ঘটিলে, চৌধুরীদের অতি প্রাচীন পুণ্য-কীর্ত্তি—অতিথি-সেবা লোপপ্রাপ্ত হইত না।

পরেশনাথ চৌধুরীর জীবদ্দশায় দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক তাঁহার দুইটী দৌহিত্রের জন্ম হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর রেণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আর একটী দৌহিত্রের জন্ম হয়। রেণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈশবাবস্থায় তাঁহার মাতা গোলাপসুন্দরী দেবী পরলোক গমন করেন। মাতৃবিয়োগের পর রেণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মী দাসী নাম্নী * একটী দাসী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন।

সন ১২৯০ সালে কলেরা রোগে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর মধ্যম পুত্র সারদাপ্রসাদ চৌধুরীর মৃত্যু হয়। তখন সারদাপ্রসাদ অবিবাহিত। এই মৃত্যুতে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্ণময়ী দেবী

---

* লক্ষ্মী দাসী আগড়ডাঙ্গার খোকা ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষের পিসুতুতো এবং জাতিতে সদ্গোপ।

অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছিলেন। স্বর্ণময়ী দেবী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত, সময় সময় সারদাপ্রসাদের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেন। ভিন্ন গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী সারদাপ্রসাদের কার্য্যদক্ষতার গল্প করিতেন। শুনিয়াছি, খুল্লতাত সারদা-প্রসাদ চৌধুরী সর্ব্বদাই আমাকে কোলে করিয়া থাকিতেন এবং আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সেই সময় চৌধুরী-বাটীতে আমিই একমাত্র শিশু ছিলাম।

পুত্রশোকে স্বর্ণময়ী দেবী দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন এবং ক্রমে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সন ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তখন স্বর্ণময়ী দেবী জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী তখন অবিবাহিত। মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রবধূ-মুখ দর্শন মানসে, স্বর্ণময়ী দেবী ১২৯৪ সালের ২৬ বৈশাখ তারিখে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীকে বিবাহ করিতে পাঠাইলেন। বীরভূম জেলার সাঁয়থিয়া থানার অন্তর্গত ঠিবা গ্রামের রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলকুমারী দেবীর সহিত ঐ রাত্রে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। বিবাহ-রাত্রে অর্থাৎ সন ১২৯৪ সালের ২৬শে বৈশাখ, রবিবার, কৃষ্ণপক্ষ, দ্বিতীয়া তিথিতে, রাত্রি চারি কিম্বা ছয় দণ্ড অবশিষ্ট থাকিতে স্বর্ণময়ী দেবী স্বর্গারোহণ করিলেন। চৌধুরীদের অতি প্রাচীন একটী পূর্ব্বদ্বারী গৃহে তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট আমি, * তাঁহার দাসী আনন্দ তাঁতিনী এবং বীরভূম জেলার সাঁয়থিয়া থানার অন্তর্গত জয়চন্দ্রপুর গ্রামের করুণা সৎগোপ্‌নী শুইয়াছিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও কন্যা

* বর্ত্তমান পুস্তকের লেখক স্বর্ণময়ী দেবীর পৌত্র কালীপদ চৌধুরী।

ত্রাঙ্গনা দেবীসহ ঐ গৃহের বারান্দায় নিদ্রা গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে স্বর্ণময়ী দেবী বলিলেন,—"করুণা! সিঁথিতে সিন্দুর দাও, আর সময় নাই।" করুণা ও আনন্দ স্বর্ণময়ীর সিঁথিতে সিন্দুর দিবামাত্র তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

স্বর্ণময়ীর মৃত্যু-রাত্রিতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বাসরগৃহে রমণীগণ নানারূপ কথা-বার্ত্তায় রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তিনি কেবল মাতা কেমন আছেন, চিন্তা করিতেছেন। ঠিক স্বর্ণময়ী দেবীর মৃত্যুসময়ে, একটা দাঁড়কাক বাসরগৃহের চালের উপর দিয়া চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। দাঁড়কাকের শব্দ শুনিয়া রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—"এইবার আমার মাতা স্বর্গলাভ করিলেন।" বাসর-গৃহস্থ রমণীবৃন্দ কোনরূপেই রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর ক্রন্দন নিবারণ করিতে পারিলেন না।

পরদিবস বর-বধূ বেলা দুই প্রহরের সময় আগড়ডাঙ্গা পৌছিলেন। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে শিবিকা পৌছিলে, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী শিবিকা-মধ্য হইতে দুই একজনকে মাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা দারুণ শোচনীয় সংবাদ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া কহিল,—"ভাল আছেন।" নপুকুরের পাড়ে গরীব ঘোষের ভাগিনেয় জানকী রায় (সৎগোপ) গরু চরাইতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কাঁদিয়া ফেলিল। তখন রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মাতা ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাধিকাপ্রসাদ মাতৃশোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনি এখনও লেখকের স্মৃতিপথে জাগরুক আছে। বর-বধূ নিম্ব-পত্র আস্বাদন করিয়া গৃহ-প্রবেশ করিলেন। রাধিকাপ্রসাদ অবগত হইলেন যে, যে সময়ে

দাঁড়কাক তাঁহার বাসর-গৃহের উপর দিয়া ডাকিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মাতা স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। আমি স্বপ্নে আমার পিতার মৃত্যু দেখিয়াছিলাম। তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। আমাদের মনে অনেক সময় ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়াপাত হয়।

ইংরাজি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে. অর্থাৎ সন ১৩০৩ সালের মাঘ মাসে, বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত ঠিবা-গ্রাম-নিবাসী শশধর চট্টরাজের সহিত, ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর কন্যা চিত্রাঙ্গনা দেবীর বিবাহ দিলেন। এই বিবাহে তাঁহাকে কিছু নিষ্কর-ভূমি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে একদিন বেলা দুই প্রহরের সময়, পরেশনাথ চৌধুরীর দৌহিত্র দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজন ধীবরকে চৌধুরীদের মণ্ডলপুকুরে মৎস্য ধরিতে আদেশ করিলেন। ধীবরগণ মৎস্য ধরিতে আরম্ভ করিল। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণী-প্রসাদ চৌধুরী এই সংবাদ পাইয়া, মণ্ডল পুকুরে উপস্থিত হইয়া, ধীবরগণকে মৎস্য ধরিতে নিষেধ করিলেন,—ধীবরেরা প্রস্থান করিল। দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,—"আপনি ঘুঘু দেখিয়াছেন, ফাঁদ দেখেন নাই।" তিনি মণ্ডলপুকুর হইতে শ্যামাচরণ রায়ের বাটী গমন করিলেন এবং শ্যামাচরণ রায়ের বাটীতে সেইদিন অবস্থান করিয়া, তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরদিন প্রত্যুষে দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁইহাট গমন করিলেন।

দাঁইহাট পৌঁছিয়া দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার পিতা বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে মণ্ডলপুকুরে মৎস্য ধরিতে বাধা দেওয়ার কথা জ্ঞাপন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রোধান্ধ

হইয়া আগড়ডাঙ্গা আগমন করিলেন এবং শ্যামাচরণ রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চৌধুরীদের কিছু করদ ভূমি আছে। পরেশনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর হইতে ঐ ভূমির অর্দ্ধেক ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী ভোগ করিতেছেন এবং অর্দ্ধেক পরেশনাথ চৌধুরীর জামাতা বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভোগ করিতেছেন। কিন্তু উভয় অংশের সম্পূর্ণ রাজস্ব একত্রে প্রদত্ত না হইলে ভূম্যধিকারী উক্ত ভূমির কর গ্রহণ করিতেন না। উভয় অংশের রাজস্ব একত্রে প্রদত্ত না হওয়াতে, ভূম্যধিকারী বেরগ্রাম-নিবাসী মুন্সি সাজেদার রহমান মিয়া বাকি করের অভিযোগ করিলেন। বিচারপতি উক্ত জমিদারের অনুকূলে অভিযোগ নিষ্পত্তি করিলে, বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উভয় অংশের সম্পূর্ণ রাজস্ব স্বয়ং প্রদান করিলেন, এবং ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর নিকট হইতে অর্দ্ধেক অংশ আদায় করিবার জন্য অভিযোগ উপস্থিত করিলেন; বিচারপতি ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর সম্পত্তি ক্রোক-বিক্রয় দ্বারা বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার আদেশ দিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী আপোষে বিষ্ণুদাস বন্দোপাধ্যায়কে তাঁহার প্রাপ্য টাকা দিতে মনস্থ করিলেন। এইস্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব্বোক্ত মৎস্য-ধৃতি-বিষয়ক ঘটনার পূর্ব্বে, বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দাঁইহাট গমন করিবার কয়েকদিন পরে, বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপুত্র দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাটিয়া দেওয়ানী বিচারালয়ের নাজির বিষ্ণু সিং এবং ঐ বিচারালয়ের পনের ষোল জন পদাতিক সহ, আগড়ডাঙ্গা আগমন করিয়া চৌধুরীদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে উদ্যত হইলেন। তারিণী-

প্রসাদ চৌধুরী টাকা যোগাড় করিবার জন্ত চারি পাঁচ ঘণ্টা সময় চাহিলেন। নাজির চারি পাঁচ ঘণ্টা সময় দিলেন, কিন্তু বাটী হইতে কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত করিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে বাটীর চতুর্দ্দিকে পাহারা রাখিলেন। বেলা তিনটার সময় টাকা দিলে, নাজির কোন সম্পত্তি ক্রোক না করিয়া চলিয়া গেলেন।

বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বাটীর চতুর্দ্দিকে পাহারা থাকায়, যথাসময়ে চৌধুরী-বংশের কুলদেবতা ৺রণরামের পূজা ও ভোগ হইল না। গ্রামের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা গোপনে বলিতে আরম্ভ করিল যে,—“এ পাপের ফল বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পরামর্শদাতা ———রায়কে ভোগ করিতে হইবে।” এই ঘটনার অনতিবিলম্বে বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, ষোড়শ-বর্ষ বয়স্ক, প্রিয়তম বেণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিল। লোকে বলিতে লাগল,—“চৌধুরীদের দেব-সেবার ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া কাহারও সুখ হয় নাই।”

সন ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ়মাসে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী এলোকেশী দেবী পরলোক-গমন করেন। তাঁহার চিকিৎসার্থ অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।

সন ১৩০৬ সালের শ্রাবণ মাসে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্র কালীপদ চৌধুরীর, বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত কুরুম্বা-নিবাসী হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা জ্ঞানদা দেবীর সহিত বিবাহ দিলেন এবং ঐ সময়েই তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর কন্যা হেমবরণী দেবীকে, তিনি কুরুম্বা-নিবাসী রমানাথ ভট্টাচার্য্যের হস্তে সম্প্রদান করেন।

ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী অমিতাচারী ছিলেন। তজ্জন্য সন ১৩১০ সালে, ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী তাঁহার সমস্ত

সম্পত্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী এবং রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্র অম্বিকাচরণ চৌধুরীকে "উইল" দ্বারা সমর্পণ করেন। আগড়ডাঙ্গার কুঞ্জ গড়াই (কলু) ঐ "উইলে" আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু বর্দ্ধমানের জজসাহেব ঐ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী ও অম্বিকাচরণ চৌধুরীর অনুকূলে উইল প্রবেট করিয়াছিলেন এবং সার্টিফিকেট লইবার হুকুম দিয়াছিলেন। কোন বিশেষ কারণ-বশতঃ উইলের সার্টিফিকেট লইবার প্রয়োজন হয় নাই। জজসাহেবের হুকুমযুক্ত উক্ত উইল বর্দ্ধমান জজকোর্টে আছে, যে কোন সময়ে সার্টি-ফিকেট লইতে পারা যায়।

সন ১৩১০ সালের আশ্বিন মাসে চৌধুরীদের দুর্গোৎসব আরম্ভ হইল। ১১ই আশ্বিন,সোমবার,দুর্গা-সপ্তমী-দিবসে, ১২ই আশ্বিন,মঙ্গলবার, মহাষ্টমী-দিবসে এবং ১৩ই আশ্বিন, বুধবার, মহানবমী-দিবসে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী, অন্যান্য বৎসরের ন্যায়, সপরিবারে জগজ্জননী দুর্গার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ১৪ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, মহাদশমী-দিবসেও তিনি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। মহাদশমী-দিবসে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর, চিরন্তন প্রথানুসারে দেবীপদে-উৎসর্গীকৃত, অপরাজিতা-লতা-নির্ম্মিত বলয় দক্ষিণবাহুতে ধারণ করিতে হয়। এ বৎসর ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী অপরাজিতা-বলয় ধারণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন,—"আমি আর অপরাজিতা ধারণ করিব না, এ বৎসর মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম, আর আমার ভাগ্যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া ঘটিবে না।"

বিজয়া-দশমীর প্রাতেই ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর একটু জ্বর হইয়াছিল, পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি একদিনও জ্ঞান-শূন্য হন নাই। সন ১৩১০ সালের ১৭ই আশ্বিন, রবিবার, ত্রয়োদশী

তিথিতে, বেলা দুইপ্রহরের সময়, ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর পরলোক গমনের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী, কনিষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী, জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র কালীপদ চৌধুরী, অচ্যুতানন্দ চৌধুরী, কনিষ্ঠ পুত্রের পত্নী নির্ম্মল-কুমারী দেবী, কনিষ্ঠ পুত্রের পুত্র অম্বিকাচরণ চৌধুরী, জ্যেষ্ঠ পুত্রের কন্যা হেমবরণী দেবী, ছকড়ি দেবী (কনিষ্ঠা কন্যা), কালীপদ চৌধুরীর পত্নী জ্ঞানদা দেবী এবং বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত জয়চন্দ্রপুর গ্রামের করুণা দাসী (সৎগোপজাতি) উপস্থিত ছিলেন। তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা চিত্রাঙ্গনা দেবী ঠিবা গ্রামে শ্বশুরালয়ে ছিলেন।

করুণা দাসী ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর পত্নীর মৃত্যুকালেও উপস্থিত ছিলেন। করুণা দাসীর মাতা রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর উপনয়নের সময় 'মুখ' দেখিয়াছিল। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী শান্তিপ্রিয়, পরদুঃখকাতর, বদান্য এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শত্রুরও বিপদ দেখিলে দুঃখিত হইতেন।

ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা সুখে অতি-বাহিত হইয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। বার্দ্ধক্যে তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি ঋণদাতৃগণ অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়াছিল। তিনি বলিতেন,—"যাঁহারা আমার সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইল, তাঁহাদের সম্পত্তিও লোকে এইরূপে ফাঁকি দিয়া লইবে।

ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন এবং বাটীতে স্ত্রীলোকের অভাববশতঃ তাঁহার যত্নের ত্রুটি হইত।

তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী
ও
রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী।

ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী, দ্বিতীয় পুত্র সারদাপ্রসাদ চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর কন্যা জন্মে নাই।

তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী ও সারদাপ্রসাদ চৌধুরীর জন্মতারিখ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। সন ১২৬০ সালে তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বতন প্রথানুসারে, তাঁহাদের মৃত্যুর পর, তাঁহাদের কোষ্ঠী গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর কোষ্ঠী আমি অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছি। রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী শকাব্দা ১৭৮১ অর্থাৎ সন ১২৬৬ সালের আষাঢ় মাসের ১৭ই তারিখে বৃহস্পতি বারে অমাবস্যা তিথিতে বেলা আড়াই প্রহরের সময় জন্মগ্রহণ করেন। রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর কোষ্ঠী ফল অত্যন্ত অমঙ্গলজনক এবং তাহা তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণরূপে ফলিয়াছিল।

এই তিন ভ্রাতার বাল্যজীবন অতি সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহাদের খুল্লতাত পরেশনাথ চৌধুরীর পরলোকগমনের পর হইতে, তাঁহাদের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত ঠিবাগ্রামের রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা এলোকেশী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পিতা ত্রৈলোক্য বিষয়কর্ম্ম দেখিতেন না, সুতরাং তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীকেই সমস্ত বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতে হইত।

দিন দিন আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতে লাগিল। ফলতঃ তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী ক্রমে ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। প্রথমে উত্তমর্ণগণ শতকরা মাসিক ৩৵৹ তিন টাকা দুই আনা হিসাবে সুদ দিবার অঙ্গীকার করাইয়া তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পিতার নিকট অঙ্গীকারপত্র রেজিষ্টারি করাইয়া লইত। ঋণদাতাগণ যখন দেখিল যে, ঋণগ্রহণ চৌধুরীদের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তাঁহারা চৌধুরীদের সমস্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিল যে, উপরোক্ত নিয়মে সুদ দিতে হইবে এবং ছয় মাস অন্তর সুদের টাকা মূলধনরূপে গণ্য হইবে এবং তখন হইতে উক্ত টাকারও উপরোক্ত নিয়মে সুদ দিতে হইবে। টাকার এতদূর প্রয়োজন হইয়াছে যে, তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী এই সমস্ত রক্তশোষণকারী প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাঁহার পিতার দ্বারা অঙ্গীকারপত্র রেজিষ্টারি করাইয়া ঋণগ্রহণ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের প্রায় সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সারদাপ্রসাদ চৌধুরী পিতামাতার জীবদ্দশায় অপরিণীতাবস্থায় অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছিলেন।

রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পত্নীর সহোদরা নির্ম্মল কুমারী (ওরফে নির্ম্মলাদেবী ওরফে নির্ম্মল দেবী) দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী কোন স্থান হইতে কিছু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর কয়েকটী সন্তান জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। খরচের ভয়ে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী একটী পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় সস্ত্রীক বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পিতা তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর সহিত পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেন। ঐ সময় রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী পৈত্রিক সম্পত্তি কিছুই পান নাই, কেবলমাত্র স্বনামে ক্রীত কয়েক

বিঘা ভূমি এবং অন্যস্থান হইতে প্রাপ্ত ভূমির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া, পৃথক বাটীতে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় চৌধুরীবংশীয়গণ এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন যে, লক্ষ্মী তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "হয় বুনিয়াদী চা'ল ছাড়, না হয় আমাকে ছাড়।" তাঁহারা বুনিয়াদি চাল ছাড়িতে পারিলেন না, লক্ষ্মীকেই ছাড়িলেন।

রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী ঋণগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঋণদাতা বলিলেন, "শতকরা ৩৶• তিন টাকা দুই আনা হিসাবে প্রতিমাসে সুদ দিতে হইবে, ঐ সুদের টাকা আসল গণ্য হইবে এবং তাহারও সুদ দিতে হইবে।" টাকার এতদূর অভাব হইয়াছে যে, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী অগত্যা অতি দুঃখের সহিত এই সর্ব্বগ্রাসকারী প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। উত্তমর্ণ এবং তাহার পুত্র, জনৈক স্বর্ণকারের দোকানে, এইরূপে ঋণ দিলে বৎসরে কতলাভ হইবে, তাহার হিসাব করিল। পিতা-পুত্রে বাটী গিয়া ঋণদাতা তাহার পত্নীকে বলিতেছে, "যদি একবার দলিল রেজেষ্টারি করিয়া লইয়া, রাধিকা চৌধুরীকে টাকা দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার নামে যত বিষয় আছে, সে সমস্ত আমাদের ঘর ঢুকিবে।" এমন সময় ঘটনাক্রমে আমি উহাদের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাহাদের পরামর্শ শুনিতে পাইলাম। তাহারা আমাকে দেখিয়া নিস্তব্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ অন্য কথা আরম্ভ করিল। আমি ঋণদাতাকে বলিলাম,—"কাকা তোমাকে ডাকিতেছেন।" সে বলিল, "যাইতেছি।" আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। যে ব্যক্তি ঋণদানের সময় এরূপ রক্ত শোষণেচ্ছা মনোমধ্যে পোষণ করে, তাহার উপার্জ্জিত সম্পত্তির এবং তাহার বংশের পরিণাম, ভবিষ্যৎ পুরুষগণকে শিক্ষা দিবে যে, ভগবানের বিচার মনুষ্যের বিচারের ন্যায় ভ্রান্তিপূর্ণ নহে। যাহাহউক, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী আপন সম্পত্তি

বন্ধক দিয়া, উল্লিখিত উত্তমর্ণের নিকট ঋণগ্রহণ করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। ঋণ পরিশোধ করিবার কোন উপায় না থাকায়, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ঋণদাতার হস্তগত হইল। বিষয় হস্তগত করিয়া, ঋণদাতা সপরিবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ঋণদাতার পুত্র তাহাদের আত্মীয় স্বজনগণের নিকট এই বলিয়া আস্ফালন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল যে, তাহার আইনজ্ঞান অত্যন্ত অধিক, নচেৎ সে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর বিষয় হস্তগত করিতে পারিত না।

এক সময় ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর সহস্রাধিক মুদ্রার প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিলেন, কেবল চল্লিশ টাকার অভাব হইল। রাধিকা-প্রসাদ চৌধুরীর বিষয় সম্পত্তি গ্রাসকারী পূর্ব্বোক্ত ঋণদাতার নিকট, তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী চল্লিশ টাকা ঋণ চাহিলেন। উক্ত ব্যক্তি বলিল যে, সে চল্লিশ টাকা ঋণ দিতে প্রস্তুত আছে, তবে তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পিতা তাহাকে একটী ভূমি চল্লিশ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলাম বলিয়া দলিল রেজেষ্টারি করিয়া দিবেন এবং তিনি চল্লিশ টাকা ফেরত দিলে ঐ ভূমি ফেরত পাইবেন, যতদিন ঐ টাকা ফেরত দিতে না পারিবেন, ততদিন সে (ঋণদাতা) কেবল সুদের টাকার পরিবর্ত্তে ঐ জমির ধান্য ভোগ করিবে। তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী তাঁহার পিতাকে সম্মত করাইয়া একটী ভূমি উক্ত ঋণদাতাকে বিক্রয় করিলাম বলিয়া, দলিল লিখিয়া দিলেন, কেবল রেজেষ্টারি করা বাকি থাকিল। ঐ ভূমির মূল্য তখন দেড়শত টাকা হইবে এবং এক্ষণে উহার মূল্য আরও অধিক। তারিণী-প্রসাদ চৌধুরী বুঝিতে পারিলেন যে, দলিল রেজেষ্টারি করিয়া দিলে, ঋণদাতা ঐ ভূমির লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না এবং চল্লিশ টাকা ফেরত দিলে, সে ঐ জমি ফেরত দিবে না। তন্নিমিত্ত তারিণীপ্রসাদ

চৌধুরী চল্লিশ টাকা পরিশোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্বিতীয় কৃতান্ত সদৃশ উক্ত ঋণদাতা দলিল রেজেষ্টারি করিয়া দিবার জন্য তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পিতাকে জেদ করিতে লাগিল। তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী বলিলেন, "শীঘ্র টাকা ফেরত দিতেছি।" কিন্তু পরসম্পত্তি-লোলুপ ঋণদাতা তাহাতে সম্মত না হইয়া, দলিল রেজেষ্টারি করিয়া দিবার জন্য তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পিতার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিল। ওয়ারেণ্টে ধৃত হইয়া বৃদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী অগত্যা দলিল রেজেষ্টারি করিয়া দিলেন। ঋণদাতা চল্লিশ টাকা দিয়া, ব্রাহ্মণের দেড়শত টাকার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিল। লোকে বলিতে লাগিল,—"কলিকালে অধর্ম্মেরই জয়!" কিছুদিন পরে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধের সময় গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী উক্ত ঋণদাতাকে বলিলেন—"এক্ষণে ভূমিটীর ন্যায্য মূল্য প্রদান কর, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধের সহায়তা করা হইবে এবং তজ্জন্য তোমার ধর্ম্ম হইবে।" কিন্তু বিষয়-সর্ব্বস্ব ঋণদাতা ভদ্রমণ্ডলীর কথায় সম্মত হইল না। তাঁহাদের মধ্যে একজন ঋণদাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যখন তখন কর পাপ, সময় পেলে ফলে!"

দেব-দ্বিজ-ভক্ত অতিথি-সেবক চৌধুরীদের এবং অন্যান্য দুই এক ব্যক্তির রক্তশোষণ করিয়া উল্লিখিত ঋণদাতা আজ "পাড়াগেঁয়ে বড়-মানুষ" সাজিয়াছে। অত্যুচ্চ একটী খড়ের স্তূপ বাঁধিয়া, ম্যালেরিয়া-মশা-জনক একটী বৃহৎ গর্ত্তে গোময় পচাইয়া, একপাল গরু বাঁধিয়া এবং একটী গরুর গাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া, সে আজ বহির্ব্বাটী সাজাইয়াছে। শ্রাবণ মাসে অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া, মাঠে যাইবার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছে; এমন সময় বাটীসংলগ্ন পথে গৌর মিস্ত্রির সহিত ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ

হইল। গৌরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি গৌর! কোথা যাবে?" গৌর মিস্ত্রি উত্তর করিল যে, সে চৌধুরীদের দেবীপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে উচ্চহাস্য করিয়া সে বলিল,—"এ বছর ভাল ক'রে চৌধুরীদের ঠাকুর গড়, আস্‌চে বার ও ঠাকুর আর গড়তে হবে না।" গৌর মিস্ত্রি বলিল,—"কেন?" সে উত্তর করিল,—"পেটের ভাত জোটে না, আবার দুর্গোৎসব ক'র্‌বে।" গৌর মিস্ত্রি জাতিতে ছুতার। তাহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাটয়া থানার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে। তাহার পিতার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহারা আজ দুই পুরুষ চৌধুরীদের দেবী-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতেছে। রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর উত্তমর্ণের বিদ্রূপ শুনিয়া, সে দুঃখিত হইয়া মনে মনে বলিল,—"কলিকালে এই সব লোকই অর্থশালী হইয়া থাকে!" ভগবন্! যে ব্যক্তি হিন্দু হইয়া, ব্রাহ্মণের স্মরণাতীত কালের দুর্গোৎসবের পতনেচ্ছা করে, জানি না তাহার বংশের এবং তাহার বিষয়ের পরিণাম, তুমি তোমার ন্যায়বিচারে কি স্থির করিয়া রাখিয়াছ।

তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী পরোপকারী, মিষ্টভাষী, সরলপ্রকৃতি, শান্তি-প্রিয়, আশাপূর্ণ, প্রফুল্ল-চিত্ত, সর্ব্বজনপ্রিয়, পরদুঃখ-কাতর, দূরদর্শী, লোক-চরিত্রাভিজ্ঞ, দেব-দ্বিজ-ভক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্যশীল এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। নিম্নলিখিত একটি ঘটনা হইতে তাঁহার পরদুঃখকাতর দেবচরিত্রের আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একদিন ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে জনৈক অনাথ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইল। বৃদ্ধা জাতিতে তন্তুবায়। তাহার একমাত্র বিধবা কন্যাকে লোকে শ্রীমুনি বলিয়া ডাকিত এবং বৃদ্ধাকে "শ্রীমুনির মা" বলিত। আগড়ডাঙ্গা অঞ্চলে একটী প্রথা আছে যে,কাহারও রাত্রিতে মৃত্যু হইলে, মৃতদেহ রাত্রেই গঙ্গাতীরে প্রেরণ করিতে হয়, নচেৎ মৃতব্যক্তির আত্মার

সদ্গতি হয় না বলিয়া লোকের সংস্কার। গঙ্গাতীর উদ্ধারণপুর (উদ্ধানপুর) আগড়ডাঙ্গা হইতে পাঁচক্রোশ দূর। উদ্ধারণপুরের গঙ্গাতীরেই তৎকালে এ অঞ্চলের শবদাহ হইত। রাত্রি একে ঘোর অন্ধকারময়ী,তাহাতে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এরূপ ভয়ানক রাত্রে মৃতদেহ গঙ্গাতীর লইয়া যাইতে কেহ সম্মত হইল না। গ্রামস্থ জনৈক ভদ্রলোক প্রকাশ করিলেন যে, এরূপ রজনীতে শব কোনরূপেই উদ্ধারণপুর (উদ্ধানপুর) প্রেরিত হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী, উক্ত অন্ধকারময়ী রজনীতে, জলে ভিজিতে ভিজিতে, তন্তুবায়, সৎগোপ, গন্ধ-বণিক, কর্ম্মকার এবং মোদকবাটী গমন করিয়া, তাহাদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উপদেশে সকলে সম্মত হইয়া, ঐ রাত্রের মধ্যেই মৃতদেহ উদ্ধারণপুর লইয়া গিয়া সৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তারিণী-প্রসাদ চৌধুরীর এরূপ পরোপকারিতার দৃষ্টান্ত অনেক আছে; পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবার ভয়ে সে সমস্ত উল্লেখ করিলাম না।

কৈলাস মণ্ডল নামক আগড়ডাঙ্গার জনৈক বৃদ্ধ, একদিন অপরাহ্নে চৌধুরীদের বৈঠকখানায় বসিয়া, তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর সহিত গল্প করিতে করিতে বলিল,—"দেখুন বাবাঠাকুর! এই যে সমস্ত বিষয় নষ্ট করে ফেল্‌চেন, শেষে কি হবে?" তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—"ছেলেরা বেঁচে থাক। আমি অপব্যয় করিলে, আমার নিন্দা হইত। চৌধুরীদের অন্নদানের ঘর, মা দুর্গা একেবারে তাহা নষ্ট করিবেন না।" এরূপ ধৈর্য্য-শীলতার, ঈশ্বর-নির্ভরতার এবং আশাপূর্ণ হৃদয়ের দৃষ্টান্ত তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর জীবনে অনেক আছে। কিন্তু রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর প্রকৃতি তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি ক্রোধী, কলহ-প্রিয়, অপরিণামদর্শী, অব্যবস্থিতচিত্ত, অসহিষ্ণু এবং শাস্ত্র-জ্ঞান-শূন্য ছিলেন।

আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, প্রতিবেশী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুন্ন হইতেন। অনেক সময় চেষ্টা করিয়াও তিনি স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। তাঁহার কোষ্ঠীর ফল এইরূপ। জন্মান্তরীণ কর্ম্ম তাঁহাকে এরূপ স্বভাবাপন্ন করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী বলিতেন যে, শ্যামাচরণ রায়ই তাঁহার একমাত্র ভীষণ শত্রু। পরেশনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর দিবস হইতে তিনি যে শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তিনি তেমনই শত্রুতাই করিবেন। তিনি আরও বলিতেন যে, জন্মান্তরীণ সংস্কারই শ্যামাচরণ রায়কে তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করাইতেছে। সুতরাং শ্যামাচরণ রায় ইচ্ছা করিলেও তাহা হইতে বিরত হইতে পারিবেন না। তিনি বলিতেন যে, ঋণদাতা তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু শ্যামাচরণ রায় তাঁহার প্রাণ লইয়াও সন্তুষ্ট হইবেন না, শেষে বংশধরগণের উপরেও শত্রুতাচরণ করিবেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, পরেশনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর, শ্যামাচরণ রায় বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, তিনি শ্যামাচরণ রায়ের বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানি মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ রায় উক্ত মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী জগজ্জননী দুর্গার সম্মুখে ছাগ, মেষ, মহিষ, কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু প্রভৃতি বলি প্রদান করিয়াছিলেন। আমার তখন বাল্যাবস্থা। তত্রাচ উক্ত বলিদানের ক্ষীণ স্মৃতি এখনও আমার মানস-পটে অঙ্কিত আছে। শারদীয়া পূজার মহানবমী-দিবসে উক্ত বলিদান সম্পন্ন হইবামাত্র, শ্যামাচরণ রায় রুধির-নিঃসৃত সদ্যোচ্ছিন্ন মহিষ মুণ্ড স্ব-মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া একঘণ্টাকাল সলম্ফ তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার আপাদমস্তক মহিষ রক্তে রঞ্জিত হইয়া পড়িল। কয়েক বর্ষ অতীত হইলে, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী শ্যামাচরণ রায়ের

বিরুদ্ধে কাটয়ার দেওয়ানী আদালতে আর একটী অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। কাটয়ার তৎকালীন প্রথম মুন্সেফ বিচার করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, এরূপ মোকদ্দমা চলিতে পারে না। মুন্সেফের মন্তব্যের বিরুদ্ধে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী বর্দ্ধমানের জজসাহেবের নিকট আপিল করিলেন। জজসাহেব বিচার করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত মোকদ্দমা অচল নহে। সুতরাং কাটয়ার মুন্সেফ উক্ত মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করিতে বাধ্য হইলেন। শ্যামাচরণ রায় মোকদ্দমার অবস্থা তাঁহার পক্ষে অনুকূল নহে শুনিয়া, কৌশলে তারিণী-প্রসাদ ও রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীকে সন্তুষ্ট করিয়া, মোকদ্দমা আপোষ নিষ্পত্তি করিলেন। তাঁহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আর কোন প্রকাশ্য অভিযোগ করেন নাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মৌখিক প্রণয়ের অভাব ছিল না।

সন ১৩১২ সালের ফাল্গুন মাসে আগড়ডাঙ্গায় কলেরা উপস্থিত হইল। সর্ব্বগ্রাসী কলেরা কয়েকটী বাটী নিঃশেষ করিয়া, চৌধুরীবাটী প্রবেশ করিল। কলেরাক্রান্ত হইয়া রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সপ্তবর্ষ বয়স্ক অম্বিকাচরণ চৌধুরী পিতামাতাকে শোক-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া, অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইল। পুত্র শোকাতুরা জননী শোকভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া সর্ব্বসন্তাপনাশী মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন। মৃত্যু যেন সতীর কথার অন্যথা করিতে না পারিয়া, প্রিয়-সহচরী কলেরাকে নির্ম্মলকুমারী দেবীর নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি কলেরাক্রান্তা হইবার তিন দিবস পর তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপদ চৌধুরী * মানভূম জেলার পুরুলিয়া সহরের ভূতপূর্ব্ব পুলিস ট্রেণিং বিদ্যা-

* বর্ত্তমান ইতিবৃত্তের লেখক।

লয়েব * অধ্যয়ন সমাপন করিয়া, বাটী আগমন করিলেন। বাটীতে পদার্পণ করিয়াই শুনিলেন যে, তাঁহার খুল্লভ্রাত-পুত্র—তাঁহার অতি আদরের ধন—প্রিয়তম অম্বিকাচরণ, পিতামাতার বক্ষে শেলবিদ্ধ করিয়া, ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদটী কালীপদ চৌধুরীর নিকট আপাততঃ গোপন রাখাই সকলে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু চৌধুরীদের হিতাকাঙ্খিনী জনৈক রমণী, "অম্বিক কৈ"—এই কথাটী কালীপদ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলে, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল এবং বলিল,—"অম্বিককে হারাইয়াছি বাবা!" সুতরাং কালীপদ চৌধুরী, বাটী প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, অম্বিক আর মরজগতে নাই।

কালীপদ চৌধুরী নির্ম্মলকুমারী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বলিলেন,—"বাবা! এসেছ? কেবল তোমাকে দেখিবার নিমিত্তই আমি আছি।" পুত্রশোকাতুরা, কলেরাক্রান্তা নির্ম্মলকুমারী দেবী ক্রন্দন করিলেন না এবং আর কোন কথা তখন বলিলেন না। অসহ্য শোকের প্রচণ্ড তাপে যে মানুষের অশ্রুর উৎস শুকাইয়া যায়, তাহা পুস্তকে পাঠ করিলেও সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না—এক্ষণে সে শোচনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম।

বিপদ যখন আসে, তখন সাগরবক্ষে তরঙ্গমালার ন্যায় একটির পর একটি! দুই দিবস পরে অর্থাৎ ইংরাজি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ তারিখে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র দুই বর্ষ বয়স্ক শঙ্করচন্দ্র চৌধুরী কলেরারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পরিবারবর্গের ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মুমূর্ষু নির্ম্মলকুমারী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শঙ্কর নাই?" উক্ত হৃদয়-বিদারক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আত্মীয় স্বজনগণ ক্রন্দন সম্বরণ

* এ বিদ্যালয় এক্ষণে পুরুলিয়ায় নাই।

করিতে পারিলেন না। চৌধুরীদের জনৈক হিতৈষিণী রমণী উত্তর করিলেন,—"শঙ্কর বৈঠকখানায় আছে।"

রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর দুইটী মাত্র সন্তান, অম্বিকাচরণ চৌধুরী ও শঙ্কর চৌধুরী কলেরারোগে অকালে কাল কবলে নিপতিত হইয়াছে এবং পত্নীও কলেরারোগে মুমূর্ষু। এই দুর্দ্দিনে আগড়ডাঙ্গা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। এ দুঃখে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়। এ দুঃখ বর্ণনা করিবার ভাষা আমাদের নাই। এ শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। কিন্তু রাধিকাপ্রসাদের এই দুর্দ্দিনে কোন্ দুই ব্যক্তি যে অমানুষিক হৃদয়শূন্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে শুধু দুর্লভ নহে,—একান্ত বিরল। মণ্ডলপুকুর চৌধুরীদের বাটী সংলগ্ন একটী পুষ্করিণী। চৌধুরীদের দুর্গোৎসবের সময় এই পুষ্করিণীর মৎস্য দ্বারা ব্রাহ্মণ-দরিদ্র-ভোজন সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পুষ্করিণী চৌধুরীদের অতি প্রাচীন একটী নিষ্কর সম্পত্তি। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী বেরগ্রামের মুন্সী সাজেদার রহমান মিয়া নামক জনৈক মুসলমানের নিকট কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুদের হার অত্যন্ত অধিক থাকায় এবং সুদ মূলধনরূপে পরিণত হইবে এরূপ অঙ্গীকার থাকায়, ঋণ এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেন না। ঋণদায়ে তাঁহার বহুসংখ্যক সম্পত্তি অতি অল্প মূল্যে নিলাম হইল এবং তাঁহার উত্তমর্ণ মুন্সী সাজেদার রহমান মিয়া ঐ সমস্ত সম্পত্তি অতি অল্প মূল্যে নিলামে ক্রয় করিলেন। মণ্ডল পুষ্করিণী কেবলমাত্র ৫০৲ পঞ্চাশ টাকায় সাজেদার রহমান মিয়া নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি নিলাম হইয়াছিল। মণ্ডল পুষ্করিণীর অর্দ্ধাংশ মাত্র সাজেদার রহমান মিয়া নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট

অর্দ্ধাংশ পরেশনাথ চৌধুরীর জামাতা বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দখলে ছিল। কেবল চৌধুরীদের দুর্গোৎসবের সময় এবং অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময় চৌধুরী-বংশীয়গণ মণ্ডল পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরাইতেন। বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর জীবদ্দশায়, একবার গ্রীষ্মকালে মণ্ডল-পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী ঐ সময়ে তাঁহাকে মৎস্য ধরিতে দেন নাই। তজ্জন্য বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে চৌধুরীদের অর্দ্ধাংশ নিলাম হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরাইতে পারেন। রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর চিরশত্রু * আগড়ডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ রায় এক্ষণে বেরগ্রামের মুন্সি সাজেদার রহমান মিয়ার কর্ম্মচারী। সুতরাং সাজেদার রহমান মিয়ার প্রতিনিধি-স্বরূপ, মণ্ডল-পুষ্করিণীর অর্দ্ধাংশের মৎস্য ধরাইবার, শ্যামাচরণ রায়ের ক্ষমতা আছে। আজ বেলা দুই প্রহরের সময় রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র শঙ্করের মৃত্যু হইল। তাঁহার প্রথম পুত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার পত্নীও মুমূর্ষু। রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর এরূপ বিপদের দিনে শ্যামাচরণ রায়, বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত যোগ করিয়া, মণ্ডল-পুষ্করিণী হইতে বড় বড় মৎস্য ধৃত করিয়া, পুত্র-শোকাতুর রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীকে দেখাইতে দেখাইতে এবং বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিদ্রূপসূচক হাস্য করিতে করিতে, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর বাটি-সংলগ্ন পথ দিয়া চলিয়া গেলেন।

* রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী বলিতেন যে, শ্যামাচরণ রায় তাঁহার চিরশত্রু। ইহা আমার মন্তব্য নহে।

এ দৃশ্য দেখিয়া রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী সহস্র বৃশ্চিক-দংশন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পুত্রশোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সন্ধ্যার সময় রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী গল্পচ্ছলে প্রতিবেশিগণকে বলিলেন,—"পাতা পড়ে, কলি হাসে। পাতা বলে, কলি! তোর একদিন আছে॥ সাজেদার রহমান মিয়ার দাসত্ব-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আজ শ্যামাচরণ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের দেবসেবার্থ নিয়োজিত পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ধৃত করিয়া, আমাকে বিদ্রূপ করিতে করিতে লইয়া চলিয়া গেল; কিন্তু এমন দিন আসিবে,—যেদিন এই সাজেদার রহমান মিয়াই শ্যামাচরণ রায়ের প্রাণসম প্রিয়তম "জামির শল্লা" পুষ্করিণীর মৎস্য ধরাইয়া, তাহাকে বিদ্রূপ করিতে করিতে লইয়া চলিয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য, রাধিকা-প্রসাদ চৌধুরীর মনস্তাপের ভরে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে!

শঙ্করচন্দ্রের মৃত্যুর পরদিন তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী কলেরা রোগাক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে কলেরা-রোগগ্রস্ত দেখিয়াও পরদিন অর্থাৎ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপদ চৌধুরী বর্দ্ধমান যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। হায় বাঙালীর চাকরী! ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ তিনি বর্দ্ধমানের পুলিস আপিসে উপস্থিত হইলেন। বর্দ্ধমানের পুলিস সুপারিন্-টেন্‌ডেণ্ট তাঁহাকে কিছুদিন পুলিস আপিসে কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। তিনি বর্দ্ধমান পুলিসের রিজার্ভ আপিসে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্দ্ধমানে একদিন নিশীথ সময়ে তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যু-দৃশ্য স্বপ্নে দেখিলেন। পরে সংবাদ পাইলেন যে, সন ১৩১২ সালের ১৩ই চৈত্র রাত্রে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী নির্ম্মলকুমারী দেবী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সন ১৩১২ সালের ১৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, শুক্লপক্ষ, পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহার

পিতা তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছিল। যে সময়ে তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর মৃত্যু হয়, ঠিক সেই সময়েই কালীপদ চৌধুরী তাঁহার মৃত্যু-দৃশ্য স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ, কালীপদ চৌধুরী কর্ম্মোপলক্ষে যখন বর্দ্ধমান যাত্রা করেন, সেই সময় তাঁহার পুত্র-শোকাতুর খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আর ত অম্বিককে পত্র লিখ্‌বে না, বাবা! তবে কাকাকে যেন মনে রাখিস্‌।" খুল্লতাতের উক্ত শোকোক্তি কালীপদ চৌধুরী কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

এই সময় কলেরারোগে আগড়ডাঙ্গা গ্রামে ত্রিশজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সর্ব্বনাশী কলেরা চৌধুরী গৃহের ন্যায় আরও কয়েকটী গৃহ প্রায় শূন্য করিয়াছিল। কয়েকটী বাল-বিধবার আর্ত্তনাদ এখনও কর্ণ বধির করিয়া দেয়। এখনও ঐ সর্ব্ব-ধ্বংসী কলেরার কথা স্মৃতিপথে জাগরূক হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। গভীর নিশীথে উক্ত কলেরার অত্যাচার স্বপ্নে দর্শন করিলে, সমস্ত রাত্রি আর নিদ্রা হয় না,—শয্যা-কণ্টক উপস্থিত হয়। নির্জ্জনে অবস্থিতি করিলে, প্রায়ই ঐ কলেরার শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া থাকি। মনুষ্য-ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা, উক্ত কলেরা সুন্দররূপে অনেককে বুঝাইয়া দিয়াছে।

যে দিবস তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী কলেরা-রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই দিবস তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপদ চৌধুরীকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন :—

১। ধার্ম্মিক-বংশে অধর্ম্ম প্রবেশ করিলে সে বংশের অধঃপতন হয় এবং অধার্ম্মিকের বংশে ধর্ম্ম প্রবেশ করিলে সে বংশেরও অধঃপতন হয়।

২। পুলিশ-বিভাগে প্রবেশ করিয়াছ, যখন যেখানে থাকিবে, স্থানীয়

সকলের সহিত যথাসম্ভব বন্ধুত্ব সংস্থাপনের চেষ্টা করিবে। তাহাতে সকল বিষয়ে উপকৃত হইবে।

ভবিষ্যতে কালীপদ চৌধুরী তাঁহার নিকট হইতে আর কোন :উপদেশ লাভ করিতে পারেন নাই। এই দুইটী উপদেশ লইয়াই কালীপদ চৌধুরী বর্দ্ধমান যাত্রা করিয়াছিলেন এবং কয়েক দিন পরে বর্দ্ধমানে তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলেন।

কালীপদ চৌধুরীর যৌবন-প্রারম্ভে তাঁহার পিতৃদেব অপরকে লক্ষ্য করিয়া কালীপদ চৌধুরীর সম্মুখে নিম্নলিখিত গল্প করিতেন :—

১। বেশ্যাসক্ত লোক কুৎসিত, দুরারোগ্য, অনারোগ্য, নানা ব্যাধি-গ্রস্ত হয়।

২। মদ্যপায়ী ব্যক্তি প্রায়ই চির-দরিদ্র হয়।

৩। মাদকসেবীকে কেহ বিশ্বাস করে না।

৪। সংসর্গ-দোষ সকল গুণ নষ্ট করে।

৫। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়।

৬। "গ্রামে মানে না, আপনি মণ্ডল"—এরূপ হওয়া ভাল নহে।

উল্লিখিত উপদেশসমূহের কিছু কিছু পালন করিয়া, কালীপদ চৌধুরী যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন।

পুত্র-কলত্রবিহীন নিঃস্ব রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরূপ অভাব হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপদ চৌধুরী তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও যত্ন করিতেন। সন ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কালীপদ চৌধুরী এক মাসের অবসর গ্রহণ করিয়া বাটী আগমন করিলে, স্বগ্রামবাসী রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর "চিরশত্রু" এবং ভিন্নগ্রামবাসী "পুরাতন শত্রু," ভেদনীতির দ্বারা কালীপদ চৌধুরীকে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর শত্রুরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করিল। অনেক দিনের পর

বাটী আসিয়া কালীপদ চৌধুরী উক্ত "চিরশত্রুর" সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহার বৈঠকখানায় ভিন্নগ্রামবাসী "পুরাতন শত্রু" উপবিষ্ট ছিলেন। কালীপদ চৌধুরী উভয়কে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে, উভয়ে গল্প আরম্ভ করিলেন যে, কপাট প্রস্তুত করাইবার উদ্দেশে তারিণী-প্রসাদ চৌধুরী যে কাষ্ঠগুলি রাখিয়া গিয়াছিলেন, কালীপদ চৌধুরীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ঐ কাষ্ঠগুলি বিক্রয় করা রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর উচিত হয় নাই। কিন্তু এরূপ গল্প শুনিয়া কালীপদ চৌধুরীর খুল্লতাত-ভক্তির লাঘব হয় নাই। বরং উক্ত শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী শ্যামাচরণ রায়ের নিকট ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ঋণ এক্ষণে সুদ সমেত একশত টাকায় পরিণত হইয়াছিল। কালীপদ চৌধুরী সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্যামাচরণ রায়ের বাটীর পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ পথ সংলগ্ন "দরজায়" * গ্রামের ভদ্র-মণ্ডলী সমবেত হইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে কালীপদ চৌধুরী শ্যামাচরণ রায়কে তাঁহার প্রাপ্য সমস্ত টাকা প্রদান করিলেন। সেই সময় শ্যামাচরণ রায় একখণ্ড লৌহ গ্রহণ করিয়া চোখ-মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন,—"আমি সমস্ত টাকা এই লোহার উপর ফেলিয়া বাজাইয়া লইব।" কালীপদ চৌধুরী ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি সমস্ত টাকা ঐরূপে বাজাইয়া লইলেন। কয়েকটী টাকা খারাপ বলিয়া ফেরত দিলে কালীপদ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ উক্ত টাকা পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। শ্যামাচরণ রায় দলিলের পৃষ্ঠে, ভদ্র-মণ্ডলীর সম্মুখে, সুদ সমেত সমস্ত ঋণের প্রাপ্তি স্বীকার লিখিলেন এবং বিরক্তির সহিত তাঁহার বৈঠকখানা বাটীর মধ্যে, উক্ত দলিলখানি কালীপদ চৌধুরীকে ফেরত দিলেন।

* বাটীর বহির্দ্বারের উত্তরপার্শ্বস্থ বৈঠকখানা।

গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব না হইলেও, পুত্রশোকাতুর বিপত্নীক রাধিকা-প্রসাদ চৌধুরীর মানসিক অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। বঙ্গ কবিকুল-তিলক, পুত্র কন্যা-দারা হীন হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় অন্ধাবস্থায় কাশীবাসকালে স্বীয় দুরবস্থার পরিচয় দিয়া লিখিয়াছিলেন—

"চৌদিকে নিরাশ ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে,
যখনি আগের কথা, মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে॥
কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হ'য়েছি হারা,
গৃহ এবে হ'য়েছে শ্মশান,
ভাবিতে সে সব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান॥
... ...
ধন নাই, বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষকালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হবে আমার।
স'য়েছি অনেক দিন, স'ব আর কত দিন,
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে।
সত্বরে এ প্রাণ হরি, এ দুঃখ ঘুচাও হরি;
এ যাতনা দিও না'ক কারে।"

শেষ জীবনের শোচনীয় দুরবস্থায় রাধিকাপ্রসাদ ও কবি হেমচন্দ্র বঙ্গমাতার যমজ সন্তান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সন ১৩২৫ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, কৃষ্ণপক্ষ ষষ্ঠী তিথিতে, শোকতাপ জর্জ্জরিত দুঃখময় জীবনের অবসান হয়!—অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

একটী হরিনাম সংকীর্ত্তনের দল, ঘটনাক্রমে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া, হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়াছিল এবং উক্ত তারকব্রহ্মনাম শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছিল।

রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁইহাট-নিবাসী বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতিদ্বন্দ্বী-বিয়োগ-ব্যথা অধিকদিন সহ্য করিতে হয় নাই! তিনিও সন ১৩২৫ সালের ৬ই চৈত্র, বুধবার, শুক্লপক্ষ, অষ্টমী তিথিতে যেন রাধিকাপ্রসাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে পরলোক গমন করেন।

কালীপদ চৌধুরী তখন কর্ম্মোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতা থানায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। খুল্লতাতের সেবাশুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত পত্নী-পুত্রাদি আগড়ডাঙ্গার আলয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পত্নী রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর মুখাগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন। কালীপদ চৌধুরীর ভগ্নীপতি মালিকাটি-নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর মৃতদেহ পতিতপাবনী, পুণ্য-তোয়া জাহ্নবী-তটে ভস্মীভূত করিয়া, সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী জাহ্নবী-জীবনে চিতা বিধৌত করা হইয়াছিল। শুনিয়াছি, শ্যামাচরণ রায় রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর মৃতদেহ সৎকারেও নাকি গোপনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন! মানুষের হৃদয় যে এত জঘন্য, এরূপ পৈশাচিক হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রাণে আঘাত লাগে! মানুষ যে ভগবানের শ্রেষ্ঠসৃষ্টি—তাঁহার অংশ দিয়া গড়া! তবে যদি এ কথা সত্য হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, মনুষ্য মাত্রেই ভগবানের সৃজিত নহে—কেহ কেহ সয়তানের সৃষ্ট!

১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় গড়বেতায়

কালীপদ চৌধুরী সালার রেল ষ্টেশান হইতে তাঁহার শিশুপুত্র সুরথচন্দ্রের প্রেরিত টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাঁহার খুল্লতাত পরলোক গমন করিয়াছেন।

যথা সময়ে অবকাশ না পাওয়ায় গড়বেতা গ্রামে তাঁহার অস্থায়ী বাসস্থানে কালীপদ চৌধুরী তাঁহার খুল্লতাতের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন।

যে সম্পত্তি লাভের জন্য, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী ও বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আজীবন পরস্পরের প্রতি শক্রতাচরণ করিয়াছেন এবং যে সম্পত্তিজনিত উভয়ের শক্রতা, চৌধুরীদের শক্রগণের পরমানন্দের বিষয় ছিল, সে সম্পত্তি কেহই সঙ্গে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না। উভয়েই শূন্যহস্তে প্রস্থান করিলেন। ইহাই জগতের চিরন্তন নিয়ম! তথাপি মনুষ্যের চৈতন্য হয় না!

তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর দুই পুত্র এবং চারি কন্যা। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অন্নপ্রাশন দিবসে কন্যাটীর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় সন্তান শ্রীকালীপদ চৌধুরী, তৃতীয় সন্তান শ্রীমতী চিত্রাঙ্গনা (চিত্রাঙ্গদা) দেবী, চতুর্থ সন্তান ৺অচ্যুতানন্দ চৌধুরী, পঞ্চম সন্তান শ্রীমতী হেমবরণী দেবী এবং ষষ্ঠ সন্তান শ্রীমতী ছকড়ি দেবী।

কালীপদ চৌধুরীর কোষ্ঠী এক্ষণে কোথায় আছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যাইতেছে না। ভবিষ্যৎ সংস্করণে কোষ্ঠী দেখিয়া যথার্থ জন্ম তারিখ লিখিত হইবে। বোধ হয়, কালীপদ চৌধুরী তাহার পূর্ব্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করিবেন। আশা করি, মৃত্যুর পর তাঁহার কোষ্ঠী যত্নের সহিত রক্ষিত হইবে।

কালীপদ চৌধুরী সন ১২৮৮ সালের ৫ই চৈত্র, কিম্বা সন ১২৯০ সালের ৫ই চৈত্র আগড়ডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অন্নপ্রাশন দিবসে মৃত্যু হওয়ায়, যথাসময়ে তাঁহার অন্নপ্রাশন হয় নাই। উপনয়নের

সময় তাঁহার অন্নপ্রাশন হইয়াছিল। পঞ্চমবর্ষ বয়সে বিদ্যারম্ভ করিয়া, গ্রাম্য পাঠশালায় আগড়ডাঙ্গার জানকীনাথ রায়, প্রসাদপুরের শশীভূষণ গাঙ্গুলী এবং শিমুলিয়া গ্রামের হরিদাস ঘোষের নিকট অধ্যয়ন করেন। খাঁড়েয়া গ্রামের মধ্যবাঙ্গলা বিদ্যালয়ে উজুর্নিয়াগ্রাম-নিবাসী মৌলবী হসরৎ তুল্লা খাঁ সাহেবের নিকট ছাত্রবৃত্তি ও কিছু ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বনয়ারিবাদ উচ্চ ইংরাজি স্কুলে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সালার এডওয়ার্ড উচ্চ ইংরাজি স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বর্দ্ধমান রাজ-কলেজে ফার্ষ্ট আর্টস্ অধ্যয়ন করেন।

কালীপদ চৌধুরীর বাল্যাবস্থা হইতেই ধর্ম্মপ্রবণতা, ইতিহাসানুরাগ, নানাবিষয়ক পুস্তক-পাঠানুরক্তি এবং প্রবল দেশ-ভ্রমণেচ্ছা পরিলক্ষিত হইত।

অধিকাংশ পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায়, কালীপদ চৌধুরীর পাঠ্যাবস্থা কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল।

সন ১৩১১ সালের ১৮ই চৈত্র ইংরাজি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ বর্দ্ধমানের তদানীন্তন পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট রায়েন সাহেব (Mr. J. V. Rayan B. A., Bar at-law) কালীপদ চৌধুরীকে এসিস্ট্যাণ্ট সাব্ ইনসপেক্টার পুলিস মনোনীত করিয়া, তাঁহাকে উক্তপদ প্রদান করিবার জন্য, কলিকাতায় ডেপুটি ইনসপেক্টার জেনারেল পুলিসকে লিখিলেন। ১৯শে মে বাঙ্গালা ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে তিনি শেষোক্ত সাহেবের পত্র পাইলেন। তিনি সিভিল সার্জ্জনের সার্টিফিকেট ও পুলিশ সাহেবের পত্র লইয়া, কলিকাতায় রাইটার্স্ বিল্ডিংএ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লিখিয়াছেন। ২০শে মে বাঙ্গলা ৬ই জ্যৈষ্ঠ বর্দ্ধমানে সিভিল সার্জ্জন কালীপদ চৌধুরীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া ভাল সার্টিফিকেট দিলেন। ২১শে মে

বাঙ্গলা ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে সিভিলসার্জ্জনের সার্টিফিকেট ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পত্র লইয়া, তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ২২শে মে, বাঙ্গলা ৮ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার প্রাতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, কলিকাতা পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টার মৌলবী ইয়াসুব উদ্দিন সাহেবের নিকট তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধীয় একটী সার্টিফিকেট লইলেন। তিনি ইন্‌স্‌পেক্‌টার জেনারেল আপিসের চিফ্ ইন্‌স্‌পেক্টার মৌলবী মুজাহরল-হক সাহেবকে তাঁহার অনুকূলে একটী সুপারিস-পত্র দিলেন। পূর্ব্বোক্ত পত্রাদি লইয়া, ঐ দিবস বেলা ১১টার সময়, রাইটার্‌স্ বিল্ডিংএ মৌলবী মুজাহরল সাহেবের সহিত কালীপদ চৌধুরী সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার আরদালি কনেষ্টবলের সহিত তাঁহাকে রাইটার্‌স্ বিল্ডিংএ ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল গাইস্ সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। গাইস্ সাহেব উক্ত পত্র ও তাঁহার সমস্ত কাগজ পত্র দেখিয়া, তাঁহাকে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কাগজগুলি আপিসে রাখিয়া দিয়া, কালীপদ চৌধুরীকে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, বাঙ্গলা সন ১৩১১ সালের ১৭ই ভাদ্র, কালীপদ চৌধুরী বর্দ্ধমানে ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল সাহেবের পত্র পাইলেন। তিনি তাঁহাকে এসিস্‌টাণ্ট সাব্ ইন্‌স্‌পেক্টার নিযুক্ত করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, যে তারিখে তিনি পুরুলিয়ার পুলিস ট্রেনিং স্কুলের কার্য্য শিক্ষার্থ যোগদান করিবেন, সেই তারিখ হইতে তিনি বেতন পাইবেন।

কালীপদ চৌধুরী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বার, বাঙ্গলা সন ১৩১১ সালের ২৩শে ভাদ্র, শুক্রবার, শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে সর্ব্বপ্রথমে মানভূম জেলার পুরুলিয়া সহরের পুলিস ট্রেনিং স্কুলে পুলিসের কার্য্যে যোগদান করিলেন। উক্ত দিবস হইতে তাঁহার কর্ম্ম-কাল গণনা হইতেছে। তখন

বার্টন সাহেব (Mr. L. H. Burton) উক্ত পুলিস ট্রেনিং স্কুলে প্রিন্সিপ্যাল এবং হারলো সাহেব (Mr. J. Hurlow) ও হীরালাল বাবু ইন্‌স্‌পেক্‌টারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুবোধ কুমার লাহিড়ি, হরিমোহন চক্রবর্ত্তী, কালী বাবু এবং নলিন বাবু নামক চারিজন সাব্‌ ইন্‌স্‌পেক্টার উক্ত স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত স্কুলে কয়েক-জন ড্রিল শিক্ষক ছিলেন। পুরুলিয়া হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী রাঁচি ও ঝালদা রাস্তার সঙ্গমস্থলে, রায়-বাঘিনী নামক স্থানে, উক্ত স্কুল অবস্থিত ছিল। উক্ত স্থান হইতে স্কুল মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

ইংরাজি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত কালীপদ চৌধুরী পুরুলিয়ার পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, কালীপদ চৌধুরী বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

কালীপদ চৌধুরী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল বেলা ৩টা পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জেলার পুলিস বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন।

কালীপদ চৌধুরী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এসিস্‌ট্যাণ্ট সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্টাররূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, বাঙ্গলা সন ১৩১৫ সালের ২২শে মাঘ বৃহস্পতিবার হইতে তিনি সাব্‌ইন্‌স্‌-পেক্‌টাররূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন।

কালীপদ চৌধুরী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ হইতে বর্দ্ধমানে রিজার্ভে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রেল তাঁহার কালনা থানায় বদলির হুকুম হইল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে পূর্ব্বস্থলী থানায় বদলির হুকুম হইল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর কালনা কোর্টে

বদলির হুকুম হইল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বর্দ্ধমান কোর্টে বদলির আদেশ হইল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি সাহেবগঞ্জ থানায় বদলির আদেশ হইল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল বরাকর থানায়, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী ফরিদপুর থানায়, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে বর্দ্ধমান থানায়, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী রায়না থানায় এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর খণ্ডঘোষ থানায় বদলির আদেশ হইল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর রাণীগঞ্জ থানায়, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী কাঁকসা থানায়, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে রাণীগঞ্জ থানায়, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট জামালপুর থানায়, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বর্দ্ধমান থানায়, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর কালনা থানায় এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী বর্দ্ধমান কোর্টে বদলির আদেশ হইল। বর্দ্ধমান কোর্ট হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুর জেলায় বদলির আদেশ হইল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল, সন ১৩২৫ সালে ১৬ই বৈশাখ, সোমবার, কৃষ্ণপক্ষ, তৃতীয়া তিথিতে, বেলা ৮টার সময় বর্দ্ধমানে ট্রেনে চাপিয়া তিনি মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। হাওড়া হইয়া ঐ তারিখেই অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর পৌঁছিলেন। পরদিন প্রাতে সাতটার সময়, মেদিনীপুর পুলিস আপিসে, তদানীন্তন পুলিস সুপারিনণ্টেণ্ডেণ্ট কোট সাহেবের (Mr. H. Cootes) সহিত দেখা করিলে, তাঁহার মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় বদলি হইল। গড়বেতা ও রামজীবনপুর থানার তুতিয়া মুসলমান নামক দুর্বৃত্ত জাতিদের (Criminal tribe) গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার আদেশ হইল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মে হইতে ১৯২০ সালের ২০শে জুন পর্য্যন্ত কলীপদ চৌধুরী গড়বেতায় অবস্থান করিয়া উল্লিখিত বিশেষ কার্য্যে (Special duty) নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১১ই

জুন তিনি মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানায় বিশেষ কার্য্যে (Special duty) বদলি হইলেন। তিনি ২১শে জুন, বাঙ্গলা সন ১৩২৭ সালের ৭ই আষাঢ়, সোমবার, নারায়ণগড় পৌঁছিয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রথমে নারায়ণগড় ও কেশিয়ারি থানার "লোধা" ও "মুচি মিয়ার দল" নামক দুর্বৃত্ত জাতিদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে তাঁহার উপর নারায়ণগড়, কেশিয়ারি ও সবং থানার দুর্বৃত্ত জাতিগণের পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল।

কালীপদ চৌধুরী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর অপরাহ্ন হইতে ১৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত একমাসের 'হক' ছুটি (Privilege Laeve) গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় বাটী গমনপূর্ব্বক, কিছু ভূমি বিক্রয় করিয়া, তাঁহার পিতার অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে বর্দ্ধমান রিজার্ভ আপিসে পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর পূর্ব্বাহ্ন হইতে ২৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ১৫ দিনের হক ছুটি (Privilege Leave) গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিনি বাটী গমন করিয়াছিলেন।

কালীপদ চৌধুরী সন ১৩১৯ সালের ২০শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, কৃষ্ণপক্ষ, পঞ্চমী তিথিতে, ইংরাজি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে, বর্দ্ধমানে বিশুদ্ধাশ্রমে, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি বর্দ্ধমান থানায় সাব্ ইন্‌স্‌পেক্টারের কার্য্য করিতেন।

কালীপদ চোধুরী বরাকর থানায় কর্ম্মকালে কল্যাণেশ্বরী দেবী কাঁকসা থানায় কার্য্যকালে সেন পাহাড়ির জঙ্গল-মধ্যস্থ শ্যামরূপী দেবী, এবং ইছাই ঘোষের দেউল (Monument), বনমধ্যস্থ রাজা চন্দ্রসেনের প্রাসাদের ও দেবমন্দিরসমূহের ধ্বংসাবশেষ, বর্দ্ধমান থানায় কর্ম্মকালে

বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন বিষ্ণুপুর রাজের দুর্গের ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় কার্য্য-কালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "দুর্গেশনন্দিনী" পুস্তকে বর্ণিত গড় মান্দারণ, চন্দ্রকোণায় চন্দ্রকেতু রাজার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, গড়বেতায় গড়বেতাদুর্গের ধ্বংসাবশেষ, নারায়ণগড় থানায় কার্য্যকালে নারায়ণগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, চৈতন্য-দেব-দৃষ্ট ধলেশ্বর বা ঝালেশ্বর শিব-স্থানের ধ্বংসাবশেষ, কেশিয়ারী থানার অন্তর্গত প্রস্তর-নির্ম্মিত, ধ্বংসপ্রায় গগনেশ্বর-দুর্গ, দাঁতন থানায় চৈতন্যদেবের পুরি-যাত্রাকালে দন্তধাবনস্থান, বর্দ্ধমানে পাঠ্যাবস্থায় শের আফগান ও নবাব কুতবুদ্দিনের সমাধি এবং বর্দ্ধমানের সমীপবর্ত্তী নবাবহাট নামক স্থানে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রাস্তার পার্শ্বে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ. বর্দ্ধমান জেলার ফরিদপুর থানায় কার্য্যকালে বীরভূম জেলার ইলাম-বাজার থানার অন্তর্গত অজয়-নদের তীরবর্ত্তী জয়দেব কেন্দুলি (কেন্দুবিল্ব) এবং অনেক সময় অনেক স্থানে পুণ্য-ক্ষেত্র ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়া, ঈশ্বর ভিন্ন সমস্তই নশ্বর—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াছেন প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিলে, তিনি হাস্য করিয়া বলেন যে, এই অট্টালিকা একদিন ধূলিকণায় পরিণত হইবে, এই হর্ম্ম্য-অশ্বালয় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হইবে, তত্রাচ ধনমদমত্ত পামর দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে।

বঙ্গকবিকুল-তিলক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মের মৃণাল" শীর্ষক কবিতাটী কালীপদ চৌধুরী প্রায়ই পাঠ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ইতিবৃত্তের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে সম্পূর্ণ কবিতাটি এ স্থলে লিপিবদ্ধ না করিয়া, কেবল দুইটী মাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। এই কবিতায় দশটী শ্লোক আছে।

"কোথা সে প্রচীন জাতি মানবের দল,
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল ?

বলবীর্য্য-পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—
কোথা সে প্রাচীনজাতি মানবের দল?
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ অবনীতে অপরূপ
দেখাইল মানবের কি কৌশল-বল—
প্রাচীন মিসরবাসী—কোথা সে সকল?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ অবনীতে অপরূপ
কোথা তারা, এবে কারা হ'য়েছে প্রবল,
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল?
জগতের অলঙ্কার আছিল সে জাতি,
জ্বালিল উন্নতি-দীপ অরুণের ভাতি,
অতুলা অবনীতলে, এখনও মহিমা জ্বলে
কে আছে সে নরধন্য কুলে দিতে বাতি?
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি?
ম্যারাথন, থার্মপলি, হ'য়েছে শ্মশানস্থলী
গিরিশ আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি,—
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি?
যার পদচিহ্ন ধরে, অন্যজাতি দম্ভ করে,
আকাশ পয়োধিনীরে ছড়াইত ভাতি—
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি?"

সন ১৩২৮ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ইংরাজি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার প্রাঙ্গণে কালীপদ চৌধুরীকে ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিয়াছিল। তিনি অবিলম্বে নারায়ণগড় ডাক্তারখানার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি কুকুর-দষ্টস্থান নাইট্রিক এসিড দিয়া দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে শিলং প্যাশ্চার ইনষ্টিচিউটে (Pasteur Institute) চিকিৎসার্থ গমন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কালীপদ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। মেদিনীপুরে পুলিস সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ও সিভিল সার্জ্জনের নিকট হইতে কাগজ পত্র লইয়া ১০ই জুন ২ এ. এম্. সময় মেদিনীপুরে ট্রেনে চাপিয়া কলিকাতা (শিয়ালদা) হইয়া শিলং যাত্রা করিলেন। সন ১৩২৮ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ইংরাজি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন অপরাহ্ন ৪॥০ ঘটিকার সময় শিলং প্যাশ্চার ইনষ্টিচিউটে (Pasteur Institute) পৌঁছিলে, শ্রীযুক্ত বাবু বিরাজমোহন দাস গুপ্ত নামক জনৈক সাব্ এসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন কালীপদ চৌধুরীর উদরের উপরস্থ চর্ম্মে দুইটী ইন্জেক্সন্ করিলেন। ইন্‌জেক্সন্ ডাইরেক্টার সাহেব স্বয়ং কিম্বা এসিস্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টার সাহেব করিয়া থাকেন। সে দিবস রবিবারের অপরাহ্নকালে তাঁহারা কেহ উপস্থিত ছিলেন না। সেইজন্য বিরাজবাবু চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

১৩ জুন, ১৫ জুন, ১৭ জুন, ১৮ জুন, ১৯ জুন, ২০ জুন, ২১ জুন, শিলং প্যাশ্চার ইনষ্টিচিউটের (Pasteur Institute) এসিস্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টার (Assistant Director) ফক্স সাহেব (Lieutenant E. C. Ross Fox I.M.D,) উদরের উপরে দুইটী করিয়া ইন্‌জেক্সন্ (Injection) করিলেন। ১৪ জুন, ১৬ জুন, ২২ জুন, ২৩ জুন, ২৪ জুন এবং ২৫ জুন শিলং প্যাশ্চার ইনষ্টিচিউটের (Pasteur Institute) ডাইরেক্টার ম্যাকি সাহেব (Major F. P. Mackie I.M.S.) পূর্ব্ববৎ তাঁহার উদরের উপর প্রতিদিন দুইটী করিয়া ইন্‌জেক্সন্ করিলেন। ১২ই জুন হইতে ২৫শে জুন পর্য্যন্ত চৌদ্দদিন চিকিৎসার পর তিনি বাটী গমন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ডাইরেক্টার সাহেব তাঁহাকে এবং তাঁহার চিকিৎসাধীন

প্রত্যেক কুকুর-শৃগাল-দষ্ট রোগীকে চৌদ্দ দিন পূর্ব্বোক্তরূপ চিকিৎসার পর একটী করিয়া সরকারি পোষ্টকার্ড দিলেন। পোষ্টকার্ডে ডাইরেক্টার সাহেবের ঠিকানা মুদ্রিত আছে। তাঁহাদের চিকিৎসার তিনমাস পরে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা উক্ত পোষ্টকার্ডে লিখিয়া ডাইরেক্টার সাহেবকে জানাইতে হইবে। কালীপদ চৌধুরী বুঝিতে পারিলেন যে, তিনমাস অতীত না হইলে, তাঁহারা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন কিনা, জানিতে পারা যাইবে না। সে সময় কালীপদ চৌধুরীর মাসিক বেতন একশত টাকার কম থাকায় তাঁহার মেদিনীপুর হইতে শিলং যাতায়াতের ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্ট বহন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে একমাসের বেতন অগ্রিম প্রদত্ত হইয়াছিল। প্যাশ্চার ইনষ্টিটিউটে (Pasteur Institute) চিকিৎসার নিমিত্ত অন্যান্য রোগীর ন্যায় তাঁহাকে কিছুই কষ্ট করিতে হয় নাই। তিনি শিলং বোর্ডিংএ অবস্থিতি করিতেন। তথায় চৌদ্দদিনে তাঁহাকে দ্বাবিংশ মুদ্রা প্রদান করিতে হইয়াছিল। শিলং হইতে ৺কামাখ্যা দর্শন করিয়া, মেদিনীপুর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত, তাঁহাকে নিজ তহবিল হইতে সর্ব্বসমেত ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

সন ১৩২৮ সালের ১২ই আষাঢ় রবিবার, কৃষ্ণপক্ষ, ষষ্ঠী তিথিতে, ইংরাজি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে কালীপদ চৌধুরী শিলং হইতে প্রাতে ৫।০ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকার সময়, অন্যান্য আরোহিগণের সহিত, তিনি মটরকারে আরোহণ করিয়া শিলং পরিত্যাগ করিলেন। অপরাহ্ন ২টা ৩০ মিনিটের সময় মটরকার তাঁহাদিগকে গৌহাটিতে পৌঁছাইয়া দিল। শিলং হইতে গৌহাটি ৬১ মাইল। রেলরাস্তা না থাকায় মটরকারে যাতায়াত করিতে হয়। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় কালীপদ চৌধুরী অশ্ব-শকটারোহণে গৌহাটি হইতে কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিলেন। অপরাহ্ন আনুমানিক ৪ ঘটিকায়

সময় তিনি ৺কামাখ্যা দেবীর যোনি-মণ্ডলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। বাল্যকাল হইতে কালীপদ চৌধুরী কামরূপে ৺ কামাখ্যা-দর্শনের অভিলাষ পোষণ করিতেছিলেন। তিনি শাক্ত; সুতরাং সর্ব্বপাপনাশিনী, চতুর্ব্বর্গ-ফল প্রদায়িনী ৺ কামাখ্যা দেবীর দর্শন লাভে আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। তিনি লোকের নিকট গল্প করিয়া থাকেন যে, তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাকে কুকুরে দংশন করিয়াছিল এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার ভাগ্যে ৺ কামাখ্যা দর্শন ঘটিল। তিনি রাত্রে তারিণীচরণ শর্ম্মা নামক জনৈক পাণ্ডার বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। পাণ্ডা যথেষ্ট যত্ন করিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন, বাঙ্গলা সন ১৩২৮ সালের ১৩ই আষাঢ়, সোমবার, প্রাতে কালীপদ চৌধুরী, কালাকৃষ্ণ শর্ম্মা নামক জনৈক পাণ্ডা দ্বারা ৺ কামাখ্যা দেবীর সম্মুখে মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী পাঠ করাইলেন এবং কামাখ্যা দেবীর যোনি-মণ্ডলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। কামাখ্যা ষ্টেসনে ট্রেনে না চাপিয়া, তিনি গৌহাটি ষ্টেসনে বেলা ১টার সময় ট্রেনে চাপিয়া, পরদিন, ২৮শে জুন, বেলা ১১টার সময় কলিকাতায় শিয়ালদহ ষ্টেসনে পৌঁছিলেন এবং সন্ধ্যা ৯টার সময় মেদিনীপুর পৌঁছিয়া অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরদিন, ২৯শে জুন, প্রাতে ৪ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানায় পৌঁছিয়া, সর্ব্বমঙ্গলময়ী ৺ ব্রহ্মাণী দেবীর সম্মুখে দেবীর পূজক হেমাঙ্গ শর্ম্মা দ্বারা মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ করাইলেন। কুকুর-দংশন ও শিলং যাত্রাকালে কালীপদ চৌধুরীর পরিবারবর্গ নারায়ণগড় অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরথচন্দ্র চৌধুরী মেদিনীপুর জেলার সড়বেতা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নোপলক্ষে তথায় ছাত্রাবাসে অব-স্থিতি করিতেছিলেন।

কালীপদ চৌধুরী বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত কুরুন্না-

নিবাসী স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। সন ১৩১১ সালের ১৭ই পৌষ, রবিবার, কৃষ্ণপক্ষ, একাদশী তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় কুরুম্বা গ্রামে কালীপদ চৌধুরীর কন্যা সুধাংশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সন ১৩২৪ সালের ১৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণপক্ষ, ষষ্ঠী তিথিতে, রাত্রি ২॥০ প্রহরের সময় আগড়-ডাঙ্গায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সন ১৩২৪ সালের ১০ই মাঘ কন্যাটীর বিবাহের দিনস্থির হইয়াছিল। সন ১৩১৬ সালের ২৪শে শ্রাবণ, সোমবার, কৃষ্ণপক্ষ, অষ্টমী তিথিতে কুরুম্বা গ্রামে তাহার একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। সন ১৩১৬ সালের ১৮ই ভাদ্র, শুক্রবার, কৃষ্ণপক্ষ, চতুর্থী তিথিতে পুত্রটী কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে। তখন তাহার নামকরণ হয় নাই। অদ্য সন ১৩২৮ সালের ১১ই ভাদ্র তারিখে কালীপদ চৌধুরীর তিন পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ সুরথচন্দ্র চৌধুরী মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে। দ্বিতীয় পুত্র সনৎকুমার মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে পাঠশালায় পড়িতেছে। তৃতীয় পুত্র প্রণবানন্দের এখনও বিদ্যারম্ভের বয়স হয় নাই। কন্যা দময়ন্তী এখন অতি শিশু।

কালীপদ চৌধুরী তাঁহার শিলং ভ্রমণ ও কামরূপে কামাখ্যা দর্শন সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক লিখিবার মানসে তথা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। সময়াভাবে এখনও উহা লিখিতে আরম্ভ করিতে পারেন নাই।

কালীপদ চৌধুরী প্রতিমাসে তাঁহার আয়ের ন্যূনাধিক পঞ্চমাংশ ব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি স্থানীয় সাধারণ পুস্তকালয় হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন।

তাঁহার সুখদুঃখময় জীবনে অনেক জ্ঞানপ্রদ ঘটনা ঘটিয়াছে। কোন কারণবশতঃ তাহা তিনি এক্ষণে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।

সন ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের শেষে (কিংবা ফাল্গুন মাসে), তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী তাঁহার কন্যা শ্রীমতী চিত্রাঙ্গনা দেবীকে, বীরভূম জেলার নান্নুর (নাঁদুর) থানার অন্তর্গত ঠিবাগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর চট্টরাজের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তখন তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পিতা ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী মরজগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন নাই। অদ্য (সন ১৩২৮ সালের ১৩ই ভাদ্র) পর্য্যন্ত চিত্রাঙ্গনা দেবীর সাতটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পুত্র জন্মে নাই। প্রথম দুইটী কন্যার একমাস বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল। পঞ্চম কন্যা অনিলা দেবী সাত বৎসর বয়সে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে ঊষা, ফুলকুমারী, আর্য্যকালী ও আর একটী কন্যা বর্ত্তমান! বর্দ্ধমান জেলার, কালনা থানার অন্তর্গত গুপ্তিপুর গ্রামের মুনীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী ঊষা দেবীর পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে শ্রীযুক্ত শশধর চট্টরাজ মহাশয়দিগের বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। ইঁহারা মুখ্য কুলীন। ইঁহাদের কাশ্যপ গোত্র এবং বিদ্যাধরী মেল। ইঁহাদের প্রবরের নাম—"কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।" ইঁহাদের চট্ট গাঁই (গাঞি) এবং চট্টোপাধ্যায় উপাধি। রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও কুমুদ চট্টোপাধ্যায় নামক সহোদরদ্বয়, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, গুরুদেব কর্ত্তৃক চট্টরাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠিবার চট্টরাজগণ কুমুদ চট্টরাজের সন্তান। সেই সময় হইতে চট্টরাজ বংশীয়েরা ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইঁহাদের অসংখ্য শিষ্য। তৎকাল হইতে এ বংশে অনেক শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখনও শশধর চট্টরাজ, নিমাই চট্টরাজ, রাধারমণ চট্টরাজ বেদান্ততীর্থ প্রভৃতি কয়েকজন শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত এ বংশে বর্ত্তমান। রাধারমণ চট্টরাজ বেদান্ত, কাব্য এবং ব্যাকরণেরও

অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। তিনি বীরভূম জেলার লাভপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক। ঠিবার চট্টরাজদিগের বাটীতে ৺রসিকরাজ নামক রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ৺রসিকরাজ দর্শন মানসে বহু লোক ঠিবা গমন করিয়া থাকে।

অচ্যুতানন্দ চৌধুরী।

তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর চতুর্থ সন্তান অচ্যুতানন্দ চৌধুরী সন ১৩২০ সালের ১লা আশ্বিন, বুধবার, কৃষ্ণপক্ষে, দ্বিতীয়া তিথিতে, বেলা দেড় প্রহরের সময় প্রায় পঁচিশ বছর বয়সে অবিবাহিতাবস্থায় অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা পূর্ব্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী তাঁহার ঔর্দ্ধ-দেহিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কালীপদ চৌধুরী কর্ম্মোপলক্ষে বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানায় তখন অবস্থিতি করিতেছিলেন।

হেমবরণী দেবী।

তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী, তাঁহার পঞ্চম সন্তান শ্রীমতী হেমবরণী দেবীকে বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত কুরুম্বা-নিবাসী স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মধ্যম পুত্র রমানাথ ভট্টাচার্য্যকে সম্প্রদান করিয়া-ছিলেন। তখন তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পিতা ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী জীবিত ছিলেন। সন ১৩২০ সালের ২৪শে কার্ত্তিক, সোমবার, শুক্লপক্ষে, দ্বাদশী তিথিতে রমানাথ ভট্টাচার্য্য অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন তাঁহার মাতা বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সন ১৩২৬ সালের ১৩ই ফাল্গুন, বুধবার স্বর্গলাভ করিয়াছেন। হেমবরণী দেবীর প্রথমে একটী

কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া তৃতীয় দিবসে প্রাণত্যাগ করে। দ্বিতীয় বারে একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া পঞ্চদশ দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হেমবরণী দেবীর তৃতীয় সন্তান শ্রীমতী এককড়ি দেবী এখন বালিকা এবং অপরিণীতা। একমাত্র কন্যাই এখন বিধবা হেমবরণী দেবীর শান্তিস্থল।

হেমবরণী দেবীর শ্বশুরবংশীয়গণের উপাধি চট্টোপাধ্যায়। তাঁহাদের কাশ্যপ গোত্র এবং সর্ব্বানন্দী মেল। যজন, যাজন, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা তাঁহাদের কার্য্য ছিল। তন্নিমিত্ত তাঁহারা সম্মানসূচক ভট্টাচার্য্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কুরুম্বা গ্রামস্থ তাঁহাদের টোলে নানাস্থানের ছাত্র ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন এবং শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন। এতদ্ভিন্ন বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সাব্‌ডিভিসনে গঙ্গাতীরে তাঁহাদের একটী সুবিখ্যাত টোল ছিল। ভারত-বিখ্যাত, ভাগবতাচার্য্য, কাটোয়া নিবাসী স্বর্গীয় রাসবল্লভ ভক্তিভূষণ উক্ত কাটোয়া টোলের ছাত্র ছিলেন।

৺শ্যামসুন্দর নামক রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ও ৺শ্রীধর নামক শালগ্রাম কুরুম্বার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের কুলদেবতা। এতদ্ভিন্ন ঘটস্থাপনা করিয়া ইঁহাদের দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। তবে বলিদান নিষিদ্ধ। ইঁহাদের ইষ্টক-নির্ম্মিত অতি প্রাচীন পূজা-মণ্ডপের জীর্ণ সংস্কার এক্ষণে একান্ত প্রয়োজনীয়।

কুরুম্বা-নিবাসী ৺পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য বংশের দৌহিত্র। তাঁহাদের পিতাকে সম্পত্তি দান করিয়া ভট্টাচার্য্য বংশীয়গণ কুরুম্বায় বাস করাইয়াছিলেন। তৎকালে কুলীন জামাতাগণকে সম্পত্তির প্রলোভন না দেখাইলে, তাঁহারা বহু বিবাহ করিতেন। এক্ষণে সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামক ৺ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটী নাবালক পৌত্র ও তিনটী পৌত্রী বর্ত্তমান আছে। ৺পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি পুত্রাভাবে দৌহিত্রগত হইয়াছে।

ছকড়ি দেবী।

তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর ষষ্ঠ সন্তান শ্রীমতী ছকড়ি দেবী, খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী কর্তৃক, সন ১৩১৪ সালের ৫ই ফাল্গুন, সোমবার, মুর্শিদাবাদ জেলার, কান্দি মহকুমার, ভরতপুর থানার অন্তর্গত মালিহাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হইয়াছিলেন। ছকড়ি দেবীর পিতা পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত কালীপদ চৌধুরী কর্ম্মোপলক্ষে তখন বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবাহ সময় অনুপস্থিত ছিলেন।

সন ১৩১৮ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ ছকড়ি দেবীর একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া ২১ দিন বয়সে উক্ত বর্ষের ৪ঠা পৌষ তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তাহার নামকরণ হয় নাই।

সন ১৩১৯ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ ছকড়ি দেবীর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উক্ত পুত্রের নাম নৃসিংহপ্রসাদ ঠাকুর ওরফে হরিগোপাল ঠাকুর। হরিগোপাল এক্ষণে (সন ১৩২৮ সালের ১৯শে ভাদ্র) পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেছে।

সন ১৩২২ সালের ৬ই পৌষ ছকড়ি দেবী একটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। কন্যাটীর অমিয়বালা নাম রাখা হইয়াছিল। অমিয়বালা পিতামাতার বড় আদরের বস্তু ছিল। কিন্তু সন ১৩২৭ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ পঞ্চবর্ষ বয়সে অমিয়বালা জনক-জননীকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া তাঁহাদের ক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সন ১৩২৪ সালের ২৮শে চৈত্র ছকড়ি দেবীর একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। পুত্রটীর ব্রজগোপাল নাম রাখা হইয়াছিল। সন ১৩২৫ সালের ৬ই পৌষ ব্রজগোপাল ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে।

সার্দ্ধ দ্বিবর্ষ বয়সে মাতৃহীন হইয়া ছকড়ি দেবী পিতা তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী কর্ত্তৃক পরম যত্নে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি পিতৃহীনা হইয়াছিলেন। একটী সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। বাল্যাবস্থা হইতে তিনি কখনও কষ্টের মুখ দেখেন নাই। এক্ষণে মর্ম্মভেদী সন্তান-শোক সহ্য করিতে না পারিয়া পীড়াক্রান্তা হইলেন। বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ চিকিৎসাসত্ত্বেও তিনি আরোগ্যলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। সন ১৩২৭ সালের ১২ই চৈত্র, শুক্রবার, কৃষ্ণপক্ষে, দ্বিতীয়া তিথিতে, রাত্রি ১০॥০ ঘটিকার সময় ছকড়ি দেবী শিশুপুত্র ও আত্মীয়-স্বজনকে শোক-সিন্ধু-নীরে নিমগ্ন করিয়া চিরশান্তিময় ধামে চিরপ্রস্থান করিলেন। "হরিবোল, হরিবোল, রাধাগোবিন্দ; রাধাগোবিন্দ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, দেববালা তিনজন আমাকে রথে করিয়া লইতে আসিয়াছে, আমি চলিলাম" এই কথা কয়টী বলিবামাত্র তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর ৩ মাস। ডাবল নিমুনিয়া রোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞানশূন্য হন নাই।

এস্থলে ছকড়ি দেবীর শ্বশুর-বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। বৈষ্ণবধর্ম্ম-স্থাপনকর্ত্তা চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর, তৎপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং ভক্তিশাস্ত্র শ্রীনিবাস আচার্য্য কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তদানীন্তন বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস ছিল যে, চৈতন্যদেবের প্রেম ও ভক্তি শ্রীনিবাস আচার্য্যের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থসমূহে এরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তি-রত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তম বিলাস, কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি

প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরিত্র বর্ণিত আছে। সন১৩০৭ সালের ৭ই ফাল্গুন বীরভূম জেলায় লুপলাইন রেলওয়ের নলহাটী ষ্টেসনের শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা "শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরিত" নামক একটী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব উল্লিখিত পুস্তকসমূহে বর্ণিত বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়। চৈতন্যের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকগণের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর স্থান কত উচ্চ ছিল, তাহা সঙ্গীত-মাধব, কর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা গোবিন্দদাস-বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত হইতে সুন্দর উপলব্ধ হয়।

ধানশী।

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীন-হীন তারণ প্রেম রসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥ ধ্রু ॥
কাঞ্চন বরণ হরণ তনু সুগলিত
কোষিক বসন বিরাজে।
প্রেম-নাম কহি কহত ভাগবতে
ঐছে বরণ তনু সাজে ॥
নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহি
প্রকটহি চরণারবিন্দ।
নিরবধি বদনে নাম বিরাজিত
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥
যুগল-ভজন-গুণ লীলা-আস্বাদন
গ্রন্থ কলপ-তরু হাতে।

তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব
(১) গোবিন্দ দাস্ অনাথে॥ *

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পূর্ব্বপুরুষগণ বর্দ্ধমান জেলার কাটয়া মহকুমার ৬।৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটস্থ চাকন্দী গ্রামে বাস করিতেন। চাকন্দী নবদ্বীপ হইতে অল্পাধিক ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। আচার্য্য প্রভুর পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত, ধর্ম্মানুরাগী ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৪৩১ শকাব্দার মাঘ মাসে, যে দিন চৈতন্যদেব কাটয়া নগরে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই দিবস গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য চৈতন্যদেবকে তাঁহার গুরুগৃহে প্রথম দর্শন করেন। তদনন্তর তিনি একান্ত চৈতন্যানুরক্ত হইয়া পড়েন এবং শ্রীচৈতন্যদাস নাম গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদাস কাটয়ার নিকটবর্ত্তী যাজিগ্রাম নামক একটী পল্লীর বলরাম আচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী একটী রূপগুণশালিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আনুমানিক ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে চাকন্দী গ্রামে লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে শ্রীনিবাস আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চাকন্দী-নিবাসী ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট শ্রীনিবাস আচার্য্য ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া, অল্পদিনের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য মাতামহ-প্রদত্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া যাজিগ্রামে মাতামহের আলয়ে বাস করেন। কাটয়া রেল ষ্টেসন হইতে যাজিগ্রাম ন্যূনাধিক ২ মাইল এবং শ্রীখণ্ড রেল ষ্টেসন

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ, সম্পাদিত "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু", প্রথম সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, সপ্তম পৃষ্ঠা।

(১) গোবিন্দদাস ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কাটয়া থানার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী। শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতির প্রণীত ভক্তি-গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলেন। কিছুদিন পরে নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, শ্রীজীব গোস্বামীপ্রমুখ চৈতন্য-চরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং বৃন্দাবন প্রদেশস্থ সমস্ত গোস্বামী-মহান্ত-সাধু বৈষ্ণবগণ শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জে সমবেত হইয়া, শ্রীনিবাস আচার্য্যকে, এক গাড়ী ভক্তিগ্রন্থ সমেত, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে "শ্রীআচার্য্য ঠাকুর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহারা নরোত্তম ও শ্যামানন্দকেও শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের সহিত প্রেরণ করিলেন এবং উপদেশ দিলেন যে, নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের সহিত, বঙ্গদেশে ভক্তি-শাস্ত্র প্রচার করিবেন এবং শ্যামানন্দ উৎকলে (উড়িষ্যায়) প্রচার করিবেন।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি দিয়াছিলেন এবং তিনি কৃষ্ণদাস নামক ছাত্রকে "শ্যামানন্দ" নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

নরোত্তম জাতিতে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। ইঁহার পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত রামপুর বোয়ালিয়া নগরের ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী গড়ের হাট পরগণার মধ্যে পদ্মাতীরস্থ খেতরী গ্রামের সমীপস্থ গোপালপুরের অধিবাসী ছিলেন। নরোত্তম তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র। তাঁহার মাতার নাম নারায়ণী। নরোত্তম বৃন্দাবনস্থ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য।

শ্যামানন্দ উৎকল প্রদেশে ধারেন্দা গ্রামে সদ্গোপজাতীয় কৃষ্ণ মণ্ডলের ঔরসে এবং দুরিকা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অন্নপ্রাশনের সময় পিতামাতা ইঁহার দুখিয়া নাম রাখিয়াছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয় চৈতন্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তৎকালে গুরু তাঁহাকে কৃষ্ণদাস নামে অভিহিত করেন। সেই সময় হইতে তিনি দুঃখী কৃষ্ণদাস নামে কথিত হইতেন। শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহাকে শ্রীরাধা ও শ্যামসুন্দরের সেবার অধিকার প্রদান করিয়া "শ্যামানন্দ" নাম প্রদান করেন।

বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় জন্মিয়াছিল। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট অধ্যয়ন করিয়া তিনজনেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম ও শক্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরে, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম ও শক্তি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ে এবং অদ্বৈত প্রভুর শক্তি ও প্রেম শ্যামানন্দের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থসহ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলে, বিষ্ণুপুরের তদানীন্তন রাজা বীর হাম্বীর ধন-রত্নপূর্ণ সিন্দুক ভ্রমে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর গ্রন্থের সিন্দুক অপহরণ করিলেন। পরে রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং রাজা, রাণী, রাজপুত্র ধাড়ী হাম্বীর, রাজার সভাপণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্ত্তী এবং কৃষ্ণ বল্লভ নামক জনৈক ব্রাহ্মণসন্তান শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, রাজা অপহৃত গ্রন্থসমূহ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

রাজা বীর হাম্বীর "হরিচরণ দাস" নাম গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বর কি উপায়ে কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অনেক অমঙ্গল হইতে পরিণামে মঙ্গল হইয়া থাকে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে আনীত সমস্ত ভক্তি-গ্রন্থসহ যাজিগ্রাম প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বঙ্গদেশে ভক্তি-শাস্ত্র প্রচারিত হইল।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া মাঘ মাসে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর যাজিগ্রাম নিবাসী গোপালদাস চক্রবর্ত্তীর কন্যা দ্রৌপদী দেবীর, বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে, পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল যাজিগ্রামে অবস্থিতি করিয়া পুনরায় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবন গমন করিলেন। শ্যামানন্দও তখন বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর শ্যামানন্দ প্রভৃতি সহ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন সময় বিষ্ণুপুর রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুপুর-রাজ বীর হাম্বীর তৎকালে শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। আচার্য্য প্রভু স্বয়ং উক্ত বিগ্রহের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই সময় বহুসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় মানভূম জেলার শিখরভূমি পরগণার অন্তর্গত পঞ্চকোটের রাজা হরিনারায়ণ আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রভু স্বয়ং তাঁহাকে দীক্ষা না দিয়া, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রের দ্বারা রাজা হরিনারায়ণকে, তাঁহার প্রার্থনা মত, শ্রীরাম মন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। আচার্য্য ঠাকুর যথা সময়ে বিষ্ণুপুর হইতে যাজিগ্রাম প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর যাজিগ্রাম প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ

অধ্যাপনা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন ও নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীত-মাধব নামক সংস্কৃত নাটক রচয়িতা এবং একান্নপদ নামক সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রণেতা গোবিন্দদাস আচার্য্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য্যঠাকুর তাঁহাকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে গোবিন্দ-দাস কবিত্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ বলিয়া সম্মানলাভ করিয়া থাকেন। গোবিন্দদাস বর্দ্ধমান জেলার কাটয়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীখণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন ও মাতার নাম সুনন্দা। গোবিন্দদাস পরে পদ্মা-তীরে তেলিয়াবুধরি গ্রামে বাস করিয়া-ছিলেন। বিখ্যাত কর্ণামৃত গ্রন্থও ইঁহারই রচিত।

বিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বীর কিছুকাল পরে পত্নীসহ যাজিগ্রাম আগমন করিয়া গুরুগৃহ দর্শন করিয়াছিলেন।

যাজিগ্রাম ও বিষ্ণুপুরে উভয় স্থানেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বাস-ভবন প্রস্তুত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর-রাজ বীর হাম্বীর আচার্য্য-প্রভুর বাস-ভবন প্রস্তুত করাইয়া দিয়া তাঁহাকে বহু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী গোপালপুর গ্রামে রঘুনাথ বা রাঘব চক্রবর্ত্তীর কন্যা পদ্মাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিণয়ের পর পদ্মাবতীর শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়া নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। আচার্য্যের প্রথমা পত্নী ঈশ্বরী দেবী শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়াকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

ঈশ্বরী দেবীর গর্ভে শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাধাকৃষ্ণ নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়ার গর্ভে গতিগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। গতিগোবিন্দ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু প্রভৃতি সংকীর্ত্তনের পুস্তকে গতিগোবিন্দ-

রচিত গীত দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া এবং কাঞ্চনলতিকা নাম্নী তিন কন্যা।

শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভু বৃন্দাবন হইতে শ্রীবংশী-বদন নামক শালগ্রাম আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীবংশীবদন এক্ষণে বুঁধই পাড়াতে ৺রাধা-মাধব দেবের মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন।

বৃন্দাবনবাসী শ্রীজীব গোস্বামী যখনই কোন নূতন গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহা বঙ্গদেশে প্রচার করিবার নিমিত্ত, তখনই শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর নিকট প্রেরণ করিতেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভু বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক বাঙ্গালা সঙ্গীত আছে। তিনি মনোহরসাহী কীর্ত্তনের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তাঁহার সহপাঠী নরোত্তম দাস ঠাকুর গড়ানহাটী কীর্ত্তনের সৃষ্টিকর্ত্তা। আচার্য্য-প্রভুর শিষ্যগণ প্রতিদিন এক লক্ষ হরিনাম করিতেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর অল্পাধিক ১৫২০ শকাব্দায় বৃন্দাবনে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। বৃন্দাবন-ধামে আচার্য্য-প্রভুর কুঞ্জে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী তিথিতে বৃন্দাবনে এবং তাঁহার জন্মভূমি চাকন্দী গ্রামে মহোৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভু যখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে মানব-লীলা সম্বরণ করেন, তখন বৃন্দাবনচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ এবং গতিগোবিন্দ নামক তাঁহার পুত্রত্রয়ের মধ্যে কেবল গতিগোবিন্দ প্রভু ইহধামে বর্ত্তমান ছিলেন। গতিগোবিন্দ প্রভুর কৃষ্ণপ্রসাদ, সুন্দরানন্দ, শ্রীহরি, সুবলচন্দ্র ও রাধামাধব নামক পাঁচ পুত্র। কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুবিখ্যাত কবি যদুনন্দন দাস সুবলচন্দ্র ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। কৃষ্ণপ্রসাদ প্রভুর পুত্র জগদানন্দ

প্রভু প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি মহকুমার কাগ্রাম থানার অধীন দক্ষিণ খণ্ডগ্রামে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে যাদবেন্দ্রনাথ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যাদবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতুলালয়ে দক্ষিণ খণ্ডগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। দক্ষিণখণ্ডের ঠাকুর মহাশয়গণ তাঁহার বংশধর।

জগদানন্দ প্রভু কোন কারণে যাজিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল শ্বশুরালয়ে দক্ষিণখণ্ড গ্রামে বাস করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করিলে, জগদানন্দ প্রভু মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরত-পুর থানার অন্তর্গত মালিহাটী গ্রামে * বাস করিয়াছিলেন। জগদানন্দ প্রভু দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে রাধামোহন, মদনমোহন, ভুবনমোহন, গৌরমোহন এবং শ্যামমোহন নামক পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

রাধামোহন ঠাকুর বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয়। তিনি একজন বিখ্যাত কবি, অসাধারণ পাণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক এবং অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সঙ্কলিত "পদামৃত-সমুদ্র" নামক সুবিখ্যাত সঙ্গীত গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় সংকীর্ত্তনে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থ-রত্ন হইতেই "মনোহরসাহি কীর্ত্তনের" এত সমাদর। তাঁহার মন্ত্রশিষ্য গোকুলানন্দ সেন পদামৃত-সমুদ্র গ্রন্থকে একটু নূতন সাজে সাজাইয়া "পদকল্পতরু" নাম দিয়াছিলেন। গোকুলানন্দ সেন বৈষ্ণবদাস নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। † ঐতিহাসিক মহারাজ নন্দকুমার

---

* মালিহাটী দক্ষিণখণ্ড হইতে ৪ মাইল এবং ব্যাণ্ডেল—বারহারওয়া রেল লাইনের সালার ষ্টেশন হইতে ২ মাইল ব্যবধান।

† শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বৈষ্ণব-ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৮৮ পৃষ্ঠা।

রাধামোহন ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজসাহি জেলার অন্তর্গত পুঁটিয়ার তদানীন্তন রাজা রবীন্দ্র নারায়ণ রাধামোহন ঠাকুরের দুইজন শিষ্যের নিকট শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। * মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব মির্জাফরের সভায় রাধামোহন ঠাকুর জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করায়, তিনি রাধামোহনের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া রাধামোহন ঠাকুরকে নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন এবং তাঁহাকে "গোস্বামী" উপাধি দিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী-পরাজয় বিষয়ক, নবাব-সভা হইতে প্রদত্ত একটী প্রাচীন কাগজের প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রণীত "শ্রীশ্রীরাধামোহন প্রভুর চরিত্র" নামক পুস্তকের শেষে প্রদান করিয়াছেন।

রাধামোহন ঠাকুর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথিতে তাঁহার জন্মভূমি মালিহাটী গ্রামে পরলোক গমন করেন। অদ্যাবধি মালিহাটীর ঠাকুর বাটীতে তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে রামনবমীর দিবসে মহোৎসব হইয়া থাকে।

রাধামোহন ঠাকুর অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা মদনমোহন ঠাকুরের বংশধরগণ এক্ষণে মালিহাটী গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা ভুবনমোহন ঠাকুরের বংশধরগণ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর মহকুমার শক্তিপুর থানার অন্তর্গত মাণিক্যহার গ্রামে (মান্‌কেহার গ্রামে) বাস করিতেছেন।

মালিহাটী গ্রামস্থ মদনমোহন ঠাকুরের পুত্র ব্রজজনানন্দ প্রভু। ব্রজজনানন্দ প্রভুর পুত্র মাধবানন্দ ঠাকুর গোস্বামী। মাধবানন্দ ঠাকুর

---

* ভক্তমাল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গোস্বামীর পুত্র রামগোপাল ঠাকুর গোস্বামী। রামগোপাল ঠাকুর গোস্বামীর পুত্র বিষ্ণুনারায়ণ ঠাকুর গোস্বামী। বিষ্ণুনারায়ণ ঠাকুর গোস্বামীর পুত্র শ্রীদীনবন্ধু ঠাকুর গোস্বামী। *

শ্রীদীনবন্ধু ঠাকুর গোস্বামীর তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীনিত্যগোপাল ঠাকুর গোস্বামী, মধ্যম শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর গোস্বামী এবং কনিষ্ঠ শ্রীলাবণ্য-গোপাল ঠাকুর গোস্বামী। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর গোস্বামী আগড়-ডাঙ্গা গ্রামে স্বর্গীয় তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর কন্যা ছকড়ি দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছকড়ি দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান নৃসিংহপ্রসাদ ঠাকুর গোস্বামী (ডাকনাম হরিগোপাল ঠাকুর গোস্বামী) এক্ষণে পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেছে। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর গোস্বামী পুনরায় সন ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় হলদি নিবাসী ৺কেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী গৌরাঙ্গিনী বালা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যবংশীয় এবং চৈতন্য-মতাবলম্বী অন্যান্য বংশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ, ৬। অন্নপ্রাশন, ৭। চূড়াকরণ, ৮। উপনয়ন, ৯। সমাবর্ত্তন ও ১০। বিবাহ প্রভৃতি দশকর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধ, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বৈদিক মন্ত্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে ইঁহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুযায়ী ঐ সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে সম্পন্ন করেন।—ইঁহারা কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রতাদি পৌরণিক ক্রিয়াও প্রচলিত আছে। বর্দ্ধমান জেলার, আসান-

---

* দীনবন্ধু ঠাকুর গোস্বামী সন ১৩২৮ সালের ১৪ই কার্ত্তিক সোমবার, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে, রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার ৯০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

সোল সব্‌ডিভিসনের ফরিদপুর থানার অন্তর্গত গৌরবাজার গ্রামের নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীগণকে দুর্গোৎসব করিতে দেখিয়াছি। তবে তাঁহাদের বলিদান নাই এবং তাঁহারা কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন।

গোকুলচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরীর কন্যা রুক্মিণী দেবীর বংশ।

গোকুলচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী, তাঁহার কন্যা রুক্মিণী দেবীকে আগড়-ডাঙ্গার কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র রায়ের হস্তে প্রদান করিয়া-ছিলেন। তখন রায়বংশীয়গণ কুলীন ছিলেন। তাঁহাদের কাশ্যপ গোত্র, চট্টোপাধ্যায় উপাধি এবং সর্ব্বানন্দী মেল। এক্ষণে তাঁহারা বংশজ।

রুক্মিণী দেবীর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস রায় ও কনিষ্ঠ রামকুমার রায়। ঠাকুরদাস রায়ের যখন আট বৎসর এবং রামকুমার রায়ের ছয় বৎসর বয়স, তখন তাহাদের পিতা গোবিন্দচন্দ্র রায় স্বর্গারোহণ করেন। রুক্মিণী দেবী সহমৃতা হইতে ইচ্ছুক হইলেন। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাঁহার হস্তের একটী অঙ্গুলিতে তুলা জড়াইয়া, তুলাবৃত অঙ্গুলিটী ঘৃতসিক্ত করিলেন। ঘৃতসিক্ত অঙ্গুলিটী একটী দীপশিখায় প্রদান করিলেন। অঙ্গুলি দগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু রুক্মিণী দেবী পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবেই রহিলেন। তখন আর তাঁহার সহমরণে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। আগড়ডাঙ্গা গ্রামের দক্ষিণ-প্রান্তস্থ ভগবনা নামক পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরে চিতা সজ্জিত হইল। রুক্মিণী দেবী মৃত পতির সহিত স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত চিতায়

ভস্মীভূতা হইলেন। তিনি চিতারোহণকালে চিতার অনতিদূরে স্বহস্তে একটী আম্রবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। আম্রবৃক্ষটী এখনও বর্ত্তমান আছে। সতী রুক্মিণী দেবীর চিতারোহণকালে পরিহিত বস্ত্রাংশ এবং সীমন্তের সিন্দূর এখনও আগড়ডাঙ্গার রায় মহাশয়দিগের ভবনে পরম যত্নে রক্ষিত হইতেছে। উক্ত সিন্দূর দ্বারা অনেক রমণীর উপকার হইয়া থাকে।

ইংরাজী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আইন করিয়া সহমরণ-প্রথা রহিত করেন।

যে পুষ্করিণী-তীরে রুক্মিণী দেবী সহমৃতা হইয়াছিলেন, সে পুষ্করিণীতে গ্রামস্থ দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন করা হইত এবং দুর্গাষষ্ঠী ও দুর্গা-সপ্তমীর দিবসে উক্ত ভগবনা পুকুরে ঘট পূর্ণ করা হইত। কয়েক বৎসর অতীত হইল, বেড়গ্রাম নিবাসী মুন্সি সাজেদার রহমান মিয়া নামক জনৈক মুসলমান পত্তন-তালুকদার উক্ত পুষ্করিণীর পাহাড় ভাঙ্গিয়া শস্যোৎপাদক ভূমি প্রস্তুত করাইয়াছেন। এক্ষণে রায়মহাশয়দিগের বড় পুকুর নামক পুষ্করিণীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন হইতেছে। এ সম্বন্ধে আর অধিক লিখিতে লেখকের সাহস হইল না।

ঠাকুরদাস রায়ের কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ও কৈলাসচন্দ্র রায় নামে দুই পুত্র। কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের প্রতাপচন্দ্র রায়, শ্যামাচরণ রায় ও গণেশচন্দ্র রায় নামে তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহদের মধ্যে এক্ষণে কেবল শ্যামাচরণ রায় ইহলোকে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার সহিত রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর ভীষণ শত্রুতা পরিলক্ষিত হইত। শ্যামাচরণ রায়ের সন্তানসন্ততি জন্মে নাই। তাঁহার কয়েকটী ভাগিনেয় আছেন।

কৈলাস রায়ের একমাত্র কন্যা খুদমণি দেবীর সহিত শান্তিপুর-নিবাসী

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল। খুহুমণি দেবীর সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই।

গোবিন্দচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রামকুমার রায়। রামকুমার রায়ের পুত্র কামাখ্যাচরণ রায় এবং কন্যা মাতঙ্গিনী দেবী—উভয়েই অপুত্রক।

গোকুল চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যার নাম অজ্ঞাত। বর্দ্ধমান জেলার কালনা সব্‌ডিভিসনের পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত চুপীগ্রামে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র রামগোপাল রায় নিঃসন্তান। স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র চৌধুরী চুপীর রামগোপাল রায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

গোকুলচন্দ্র চৌধুরীর তৃতীয় কন্যার নামও নির্ণয় করিতে পারি নাই। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর মহকুমার, শক্তিপুরের সমীপবর্ত্তী পাটকে বাড়ীতে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তথায় তাঁহার বংশধরগণ অবস্থিতি করিতেছেন, শুনিয়াছি। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন অনুসন্ধান করা হয় নাই।

ইন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা চৌধুরীর সহিত দৈবকীনন্দন শর্ম্মা চৌধুরীর কিরূপ সম্বন্ধ তাহা সঠিক বলিতে পারা যায় না। তবে প্রাচীন কাগজপত্র হইতে অনুমান হয় যে, তাঁহারা সহোদর ছিলেন।

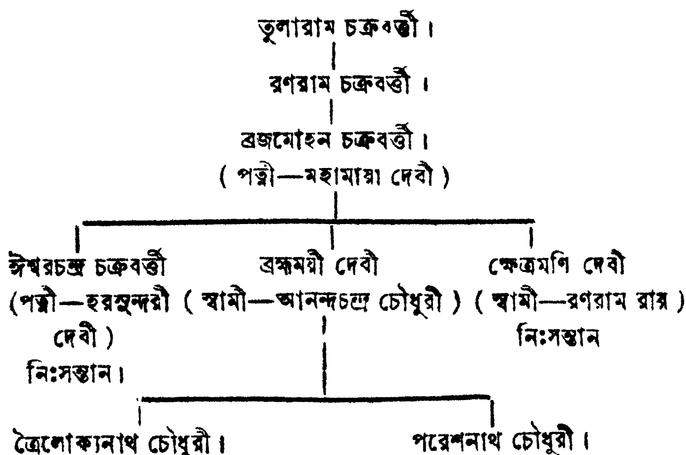
ইন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা চৌধুরীর পুত্র গঙ্গাধর চৌধুরী। তাঁহার পুত্র তারাধন চৌধুরী সন ১২০৯ সালের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কোন্ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। ইঁহার পত্নী জাহ্নমণি দেব্যা প্রচলিত নাম জাহ্নমণি দেব্যা বিধবাবস্থায় কিছুদিন জীবিত ছিলেন।



দ্বিতীয় খণ্ড।

আগড়ডাঙ্গার চক্রবর্ত্তী-বংশ।

(ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর মাতামহ বংশ।)



তুলারাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র রণরাম চক্রবর্ত্তী। রণরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী। মহামায়া নাম্নী একটী কন্যার সহিত ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হইয়াছিল। ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক পুত্র এবং ব্রহ্মময়ী দেবী ও ক্ষেত্রমণি দেবী নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আগড়ডাঙ্গার তিন মাইল উত্তর আইজুনি গ্রামে হরসুন্দরী নাম্নী একটী কন্যার সহিত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে নাই। আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীদের দুর্গাবাটীর বৃহৎ গুলঞ্চ বৃক্ষটি ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক রোপিত।

ব্রহ্মময়ী দেবীর সহিত আগড়ডাঙ্গার আনন্দচন্দ্র চৌধুরীর পরিণয় হইয়াছিল। ব্রহ্মময়ী দেবীর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ পরেশনাথ চৌধুরী। ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর বংশধরগণ আগড়ডাঙ্গার পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেছেন। পরেশনাথ চৌধুরী অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা গোলাপসুন্দরী দেবীর বংশধরগণ দঁাইহাটে পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেছেন।

ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয়া কন্যা ক্ষেত্রমণি দেবীর আগড়ডাঙ্গার রণরাম রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ক্ষেত্রমণি দেবী নিঃসন্তান ছিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের পৈত্রিক বাটীর পূর্ব্বে বড়গড়ে নামক পুষ্করিণী, পশ্চিমে "মাঝগাঁ" নামক রাস্তা এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুইটী রাস্তা। এই বাটী গোষ্ঠ প্রমাণিক ও শিবদাস দাস (তন্তুবায়) চৌধুরী মহাশয়দের নিকট ক্রয় করিয়া, গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছে। এক্ষণে চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের একটী গৃহও বর্ত্তমান নাই। সর্ব্বগ্রাসী কাল সমস্তই গ্রাস করিয়াছে! ইহাই জগতের নিয়ম! জানি না ভবিষ্যতে আবার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে!

আগড়ডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশ।

(চৌধুরীবংশীয়গণের পুরোহিত-বংশ।)

আগড়ডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য-বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, দশকর্ম্ম, পুরাণ এবং ন্যায়-দর্শনের পণ্ডিত ছিলেন। আমি বাল্যকালে তাঁহাদের গৃহে তিরেট পত্র, তাল পত্র এবং কাগজে লিখিত এত পুস্তক দেখিয়াছিলাম যে, তাহাতে পাঁচখানি গাড়ী পূর্ণ হইত। বহু প্রাচীন পুস্তকগুলি সর্ব্বধ্বংসী কালের

কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। জীর্ণ এবং কীটদষ্ট পুস্তকসমূহ কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পুষ্করিণী-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এখনও তাঁহাদের গৃহে এত প্রাচীন পুস্তক দৃষ্ট হয় যে, তাহাতে একটী শকট পরিপূর্ণ হয়। ঐ সমস্ত পুস্তকের মধ্যে শকাব্দা ১৬১১ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ তারিখে শিবরাম দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক লিখিত একটী আধ্যাত্মিক রামায়ণ দৃষ্ট হইল। উক্ত লেখকের লিখিত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর একটী প্রতিলিপি বর্ত্তমান আছে। একটী নৃসিংহ পুরাণের ও একটী মনুসংহিতার প্রতিলিপি দৃষ্ট হইল। পুস্তক দুইটীতে লেখকের নাম ও তারিখ লেখা নাই। একটী সন ১১৮১ সালের লিখিত রুদ্রচণ্ডীর প্রতিলিপি বর্ত্তমান আছে। তাহাতে লেখকের নামোল্লেখ নাই। হরিপ্রসাদ শর্ম্মা লিখিত ১৭৫৮ শকাব্দার একটী পঞ্জিকা দৃষ্ট হয়। রামদুর্লভ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ১২৩৮ সনে লিখিত এবং মাধব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সন ১১৯৩ সালে লিখিত পুস্তকদ্বয় বর্ত্তমান আছে।

আগড়ডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশে রামনাথ বিদ্যাবাগীশ ও পরীক্ষিত ভট্টাচার্য্য নামক পণ্ডিতদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সন ১২০৯ সালের লাখরাজ সম্পত্তির ডায়দাদে তাঁহাদের নাম দৃষ্ট হয়।

হারাধন ভট্টাচার্য্য, রণ ভট্টাচার্য্য এবং বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তিন সহোদর। হারাধন ভট্টাচার্য্যের পুত্র ছিল না। বর্দ্ধমান জেলার, কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত রাঁউদি গ্রামে তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ এবং অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হারাধন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুই দৌহিত্র। উভয়েই স্মৃতির অধ্যাপক। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বস্থলী-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয়ের ছাত্র। রাঁউদির ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের স্মৃতির টোল অতি প্রাচীন।

রণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একমাত্র পুত্র গয়ানাথ ভট্টাচার্য্য অপুত্রক। গয়ানাথ ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদ জেলার কাগ্রাম থানার অন্তর্গত আওচা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার একমাত্র কন্যা যাদুমণি দেবীকে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত বক্সটিয়া গ্রামের রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় আগড়ডাঙ্গা গ্রামে শ্বশুরালয়ে বাস করিয়াছিলেন। রাজীব-লোচন মুখোপাধ্যায়ের হস্তলিখিত একটী পুস্তকের, সন ১২১২ সালের প্রতিলিপি আগড়ডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের (মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের) বাটীতে এখনও বর্ত্তমান আছে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের সন্তান-সন্ততিগণের সময় হইতে ভট্টাচার্য্য বংশকে লোকে মুখোপাধ্যায় বংশ বলে।

যাদুমণি দেবীর গর্ভে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় (প্রকাশানাম নফরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) নামক এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় গঙ্গাটিকুরি গ্রামে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও নীলরতন মুখোপাধ্যায় নামক ছয় পুত্র এবং চন্দ্রদেবী ও সৌদামিনী দেবী নামক দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

এক্ষণে কেবল বামনদাস মুখোপাধ্যায়, নীলরতন মুখোপাধ্যায় ও সৌদামিনী দেবীর বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এক্ষণে (সন ১৩২৮ সালের ২রা আশ্বিন) বহরমপুর কলেজ বি. এ. ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছেন।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং উমাশঙ্ক

মুখোপাধ্যায় (ডাক নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বীরভূম জেলায় বোলপুর মহকুমার অন্তর্গত লাঙ্গলহাটা গ্রামে সৌদামিনী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লাঙ্গলহাটা গ্রামে বাস করিতেছেন।

আগড়ডাঙ্গার—
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ।

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপুত্র রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারিসম্বন্ধীয় শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির রাজবাটীর দেওয়ান ছিলেন। কান্দির রাজগণ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং লালাবাবুর বংশধর। কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় পর্য্যন্ত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বংশে কেহ রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। কান্দির রাজবাটীকে তখন লোকে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বাটী কিম্বা লালাবাবুর বাড়ী বলিত।

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আগড়ডাঙ্গার আনন্দচন্দ্র চৌধুরী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। যখন ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর দশ পনের বৎসর বয়স, সেই সময় কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। তিনি পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার যত্নে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধরগণ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুকুর ও সেকারোগড়ে নামক পুষ্করিণীদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়া পুষ্করিণী দুইটীকে নূতনে পরিণত করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালীপূজায় মহাসমারোহে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, দরিদ্র, আত্মীয়, স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি অসংখ্য ব্যক্তিকে ভোজন করান হইত।

আগড়ডাঙ্গা গ্রামে তৎকালে দুইজন দীর্ঘাকার এবং বলবান কলু বাস করিত। তাহারা চুরি করিতে আরম্ভ করায় গ্রামবাসিগণ উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কান্দি হইতে দুইজন বলবান হিন্দুস্থানী নগ্দি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নগ্দিদ্বয় আগড়ডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া কলু দুইজনের বাহু ধরিয়া,তাহাদিগকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া, চারিবার আগড়ডাঙ্গা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। কলুদ্বয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শপথ করিয়াছিল যে, তাহারা আর কখনও চুরি করিবে না।

একবার কর্ত্তিক মাসে বৃষ্টির অভাব হইলে, আগড়ডাঙ্গা, উচুণ্ডি এবং আলেপুরের মুসলমানগণ বলপূর্ব্বক কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গাপুষ্করিণীর জল লইয়া ধান্য-ক্ষেত্র সিঞ্চন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কান্দি হইতে চারিজন বলশালী, উন্নত দেহ, প্রশস্ত বক্ষঃ হিন্দুস্থানী নগ্দি প্রেরণ করিলেন। তাহারা নেঙ্গট পরিধানপূর্ব্বক দীর্ঘ উষ্ণীষে মস্তক আবৃত করিয়া, দুর্গাপুকুরের চারি পাহাড়ে চারিজনে দীর্ঘ যষ্টি স্কন্ধে লইয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের কৃতান্ত-সদৃশ আকৃতি দর্শন করিয়া মুসলমানগণ কোদালি, ঝুড়ি এবং হুঁকা ফেলিয়া প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিল। কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভু গোপনানুসন্ধানে অবগত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আগড়ডাঙ্গার বাটী এখনও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেওয়ানজি! আপনি আমার বাটীতে কর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধ হইলেন, কিন্তু এখনও বাটী পাকা করেন নাই কেন?" কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর করিলেন,—"আমি

অবিশ্বাসী নহি এবং জীবন অস্থায়ী—এই নিমিত্ত বাটী পাকা করিতে সমর্থ হই নাই।”

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক বিংশতি মুদ্রা বেতনে কান্দিতে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধরগণের সংসারে কার্য্য করিতেন। তৎকালের বিংশতি মুদ্রা বর্ত্তমান পঞ্চশত মুদ্রারও অধিক। শুনিয়াছি, কলিকাতা শোভাবাজার রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ দেব মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন এবং মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। *

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাসিক বেতন বিংশতি মুদ্রা ছিল। তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, মাসিক বিংশতি মুদ্রা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আহ্নিক করিতেছেন, এমন সময় একটী বিবাহের বাদ্য শুনিতে পাইলেন। তিনি ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, জনৈক বংশজ পাত্রের সহিত একটী কুলীন পাত্রীর উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—“ব্রাহ্মণ, বংশটী নাশ করিল।” প্রবাদ আছে যে কন্যাটীর সন্তান হয় নাই।

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র জন্মে নাই। তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে বীরভূম জেলার, রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত বসয়া গ্রামের † একটী পাত্রের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কন্যাটীর একমাত্র পুত্র শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় বসয়া গ্রামে পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেন। শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীঅনন্তলাল মুখোপাধ্যায় এক্ষণে বসয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

---

* Mutagherin Translation Vol. I. P. 773 Note.

† লোকে এই গ্রামকে বসয়া-বিষ্ণুপুর বলে।

পুত্রাভাবে কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার জীবদ্দশাতেই, শ্রাদ্ধকালে করণীয় ব্রাহ্মণ-ভোজন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়, কাঙ্গালি বিদায় প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক গমনের পর, তাঁহার ভ্রাতা গয়ানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মঙ্গলা দেবী কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত কালীপূজা পরম যত্নে সম্পন্ন করিতেন। মঙ্গলা দেবী উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া, সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ অজ্ঞাত ভাবে দুই দিন গৃহমধ্যে থাকায় পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছিল। সেইজন্য উহা সৎকারার্থ গঙ্গাতীর লইয়া যাইতে অনেকে ইতস্ততঃ করিয়াছিল। শেষে মাখন ঘোষের মাতা, রাখাল ঘোষের পিতামহী, বল্লভ ঘোষের মাতা এবং অনন্ত ঘোষের মাতামহী উক্ত মৃতদেহ সৎকারার্থ গঙ্গাতীর লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে, গ্রামস্থ পুরুষেরা উহা গঙ্গাতীর লইয়া গিয়া সৎকার করিয়াছিল।

এক্ষণে কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীপূজা তাঁহার দৌহিত্র-পুত্র শ্রীঅনন্তলাল মুখোপাধ্যায় চালাইয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন কালীপূজাটী তিনি চালাইবেন, তবে তাঁহার মৃত্যুর পর উহা বোধ হয়, কেহ চালাইবে না।

এক্ষণে কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃহৎ বাটীতে কেবলমাত্র একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কালীমন্দির বর্ত্তমান আছে। কালীমন্দিরটী আধুনিক। তাঁহার বাটী আঠারটী অংশে বিভক্ত ছিল। এরূপ বৃহৎ বাটী পল্লীগ্রামে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সমস্ত গৃহগুলিই সর্ব্বগ্রাসী কালের কঠোর নির্য্যাতনে ধূলিকণায় পরিণত হইয়াছে। উক্ত বাটীর পূর্ব্বে ভৈরব গড়াইএর বাটী, পশ্চিমে চৌধুরীদের নিষ্কর ভূমিতে নির্ম্মিত অনন্ত ঘোষ ও রাখাল ঘোষের বাটী, উত্তরে দুর্গাপুষ্করিণী এবং দক্ষিণে সাধারণ রাস্তা।

প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ-স্বরূপ কালীপূজা বন্ধ হইলে, পুণ্যাত্মা কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পবিত্র স্মৃতি চিরদিনের জন্য লোপপ্রাপ্ত হইবে। মা জগদম্বে! ইহাই কি তোমার ইচ্ছা !!

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ শাক্ত ছিলেন। তাঁহাদের দুর্গাপূজায় ষষ্ঠী, সপ্তমী, মহাষ্টমী, সন্ধিপূজা, মহানবমীপূজা এবং বিজয়া-দশমী-দিবসে ছাগবলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। দশমী দিবসে দুর্গার বাসি অন্ন-ব্যঞ্জনের ভোগ হইয়া থাকে। দশমী-দিবসে ব্রাহ্মণগণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটীতে দেবীর বাসি অন্ন-ব্যঞ্জন-প্রসাদ ও সিদ্ধ মাংস ভোজন করিয়া থাকেন।

চৌধুরীদের দুর্গার নিকট বলিদান হইবার পর, বন্দ্যোপাধ্যায়দের দুর্গার সম্মুখে বলিদান হইয়া থাকে।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র জন্মে নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যার সহিত রামমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবকের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে বাটীতে রাখিয়াছিলেন। রামমোহন চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মতামহালয়ে বাস করিয়া পরম যত্নে মাতামহ-বংশের নিয়মানুসারে দুর্গোৎসব করিতেন। বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক-মাত্র পুত্র আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় পিতার ন্যায় যত্নে দুর্গোৎসব করিতেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না। তিনি অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছিলেন।

* ইংরাজি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ কিম্বা জ্যৈষ্ঠমাসে আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক গমনের পর তাঁহার মাতা ও সহধর্ম্মিণী পরিতোষ কুমারী দেবী কিছুদিন একত্রে দুর্গোৎসব পরিচালন করিয়াছিলেন।

পরিতোষ কুমারী দেবীর পিত্রালয় মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণ থানার অন্তর্গত খোসবাসপুর গ্রাম। পরিতোষ কুমারী দেবী তাঁহার পিতা রামবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে খোসবাসপুরে পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিয়া, ক্রমে ক্রমে স্বামীর প্রায় সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। শেষে দুর্গোৎসব বন্ধ হইল। পরিতোষ কুমারী মহানবমীর দিন ঘটস্থাপনা করিয়া একদিন মাত্র দুর্গাপূজা করিয়া, একটী কুষ্মাণ্ড বলি প্রদান করিতেন। এই সময় আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গামন্দির ও অন্যান্য সমস্ত গৃহই ভূমিসাৎ হইয়াছিল। তাঁহার মাতা আগড়ডাঙ্গায় সরসীমোহন রায়ের বাটীতে (ফুল রায়দের বাটীতে) তৎকালে বাস করিতেন।

সন ১৩২৮ সালের আশ্বিন মাসে পরিতোষ কুমারী দেবী আগড়ডাঙ্গা আগমন করিয়া, নাপিত বাটীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক, নবমী-দিবসে দুর্গাপূজার উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সন ১৩২৮ সালের ২৪শে আশ্বিন, সোমবার, শুক্লপক্ষে, মহানবমী তিথিতে ঘটস্থাপনা পূর্ব্বক দুর্গাপূজা করিয়া, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলেন। শূদ্রভোজন সমাপ্ত হইলে, ঐ দিবস বেলা পাঁচটার সময়, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী পরিতোষ কুমারী দেবী ইহধাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। ধন্য তাঁহার মৃত্যু!

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মাতা পরম যত্নে পরিতোষ কুমারী দেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়দের দুর্গোৎসবটী পরিচালন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিবদাস (শিবু) বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আগড়ডাঙ্গার এই বন্দ্যোপাধ্যায়

বংশের জনৈক ভদ্রলোক, এক্ষণে বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত গুপিনপুর (গোপীনপুর) গ্রামে বাস করিতেছেন।

আগড়ডাঙ্গার গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরগণ পণ্ডিত-রত্নী মেলের কুলীন।

বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটীর পশ্চিমে গৌর স্বর্ণকার ও নাপিতদের বাটী, উত্তরে জয় স্বর্ণকারের বাটী এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে ভূমি।

নীলকণ্ঠ রায়ের বংশ।

নীলকণ্ঠ রায় ও ত্রিলোচন রায় দুই সহোদর। তাঁহারা রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

গোলক চাঁদ (চন্দ্র) নামক আগড়ডাঙ্গার জনৈক ধনশালী, নিঃসন্তান গন্ধবণিক একটী শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়া, নীলকণ্ঠ রায়কে পুরুষানুক্রমে উক্ত শিবের পূজক নিযুক্ত করেন। গোলক চাঁদ নীলকণ্ঠ রায়কে শিব-মন্দির সংলগ্ন একটী নিষ্কর বাটী ও কিছু দেবোত্তর ভূমি প্রদান করেন। নীলকণ্ঠ রায় পুরুষানুক্রমে উক্ত বাটীতে বাস করিয়া শিব-পূজা করেন।

নীলকণ্ঠ রায়ের শ্যামা দেবী, কুমেদ দেবী, দক্ষবালা দেবী নামক তিন কন্যা এবং কাঙ্গালীচরণ রায় নামক এক পুত্র।

নীলকণ্ঠ রায় আগড়ডাঙ্গার আনন্দচন্দ্র চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র পরেশনাথ চৌধুরীর সহিত কুমেদ দেবীর এবং মুনুটি গ্রামের সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত দক্ষবালা দেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

কাঙ্গালীচরণ রায় কলিকাতায় বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই।

ইংরাজি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কিম্বা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কাঙ্গালীচরণ রায়

পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তদীয় পত্নী কলিকাতায় পিত্রালয়ে বাস করেন। কাঙ্গালীচরণ রায়ের বাটীতে এক্ষণে * কেবল গোলক চঁাদ প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরটী বর্ত্তমান আছে, অন্য গৃহগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় নামক আগড়ডাঙ্গার জনৈক ভদ্রলোক এক্ষণে উক্ত শিবের পূজা করিয়া থাকেন।

কাঙ্গালীচরণ রায়ের বাটীর পূর্ব্বে মাঝ-গ্রাম বা মাঝ-গাঁ নামক রাস্তা, পশ্চিমে অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, উত্তরে একটী ক্ষুদ্র রাস্তা এবং দক্ষিণে একটী রাস্তা ও সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়দের বাটী।

কাঙ্গালীচরণ রায়ের ভগিনী শ্যামাদেবীর সন্তান-সন্ততি নাই। তিনি ভ্রাতৃগৃহে আগড়ডাঙ্গায় বাস করিতেন। এক্ষণে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তাঁহার দ্বিতীয়া ভগিনী কুমেদ-কামিনী দেবীর একমাত্র কন্যা গোলাপ-সুন্দরী দেবীর পুত্র দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাটয়ার নিকটবর্ত্তী দাঁইহাটে পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেছেন।

তাঁহার তৃতীয়া ভগিনী দক্ষবালা দেবীর পুত্র শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অন্তর্গত পাঁচ-থুপির নিকটবর্ত্তী মুন্মুটিগ্রামে পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেছেন।

আগড়ডাঙ্গার সরকার-বংশ।

সরকারদের উপাধি গঙ্গোপাধ্যায় এবং সাবর্ণ গোত্র। কোন নবাব ইঁহাদিগকে সরকার উপাধি দিয়াছিলেন।

রামচঁাদ সরকার ও ভগবান সরকার দুই সহোদর। ইঁহারা আগড়-

* সন ১৩২৮ সালে।

ডাঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত খয়রা গ্রামে বাস করেন।

রামচাঁদ সরকারের কৃষ্ণচন্দ্র, তারাদাস ও দুর্গাদাস নামক তিন পুত্র এবং খোকন (মঙ্গলা) নাম্নী এক কন্যা। দুর্গাদাস সরকার আগড়-ডাঙ্গার সমীপবর্ত্তী কচুটিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

ভগবান সরকারের কেদার, চন্দ্র, ভোলানাথ, ফণীন্দ্র, মণীন্দ্র এবং আরও দুইটী পুত্র। তাহাদের মধ্যে ফণীন্দ্র সরকার বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত আনখোনা গ্রামে বাস করেন।

সরকারদের আগড়ডাঙ্গার বাটীর পূর্ব্বে দুর্গাদাস চঁদের বাটী, পশ্চিমে গোপালচন্দ্র প্রমাণিকের বাটী, উত্তরে গোপালচন্দ্র প্রমাণিকের ভগিনীপতি ছবিলাল চঁদের বাটী এবং দক্ষিণে গোপালচন্দ্র স্বর্ণকারের বাটী। এই স্থানটী এক্ষণে আশুতোষ চঁদ-সরকার-বংশধরগণকে রাজস্ব দিয়া উপভোগ করিতেছেন। এই স্থানে এক্ষণে একটী গৃহও বর্ত্তমান নাই। তথাপি স্থানটীকে এখনও লোকে সরকারদের বাটী বলে।

আগড়ডাঙ্গার রায়-বংশ।

রায়-বংশীয়গণ রাঢ়ীয়-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহারা এক্ষণে বংশজ। ইঁহাদের কাশ্যপগোত্র এবং পূর্ব্ব উপাধি চট্টোপাধ্যায়। কোন নবাব ইঁহাদিগকে গৌরব-সূচক রায় উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

আগড়ডাঙ্গা গ্রামের পশ্চিম মাঠে কৃষ্ণ রায়ের পুকুর নামক একটী পুষ্করিণী আছে। লোকে ইহাকে কেষ্টা রায়ের:পুকুর বলে। বৃষ্টির অভাব হইলে, কৃষকেরা ইহার জল ধান্য-ক্ষেত্রে সেচন করে। তৃষ্ণার্ত্ত কৃষক ও পথিকগণ ইহার জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। পূর্ব্বকালে ইহার তীরে কয়েকটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ পথশ্রান্ত পথিক ও পরিশ্রান্ত কৃষকদিগকে

স্নিগ্ধ ছায়া ও শীতল সমীরণ দানে তাহাদের শ্রান্তি অপনোদন করিত। কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে রায়েদের ভদ্রাসন অবস্থিত ছিল এবং এইটী তাঁহাদের খিড়্কী পুকুর।

শ্যামসুন্দর রায়ের বংশ।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চারি পুত্র।* শ্যামসুন্দর রায়, বাবুরাম রায়, গোবিন্দ রায় এবং রামশঙ্কর রায়। ক্রমান্বয়ে এই চারি ভ্রাতার বংশ-বিবরণ বর্ণিত হইবে।

শ্যামসুন্দর রায়ের পুত্র রামনাথ রায়। রামনাথ রায়ের পুত্র দেবীপ্রসাদ রায়। দেবীপ্রসাদ রায়ের পুত্র দুর্গাদাস রায়। দুর্গাদাস রায়ের দুই পুত্র—অযোধ্যারাম রায় ও শ্রীরাম রায়। † শ্রীরাম রায়কে আমি দেখিয়াছি। তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। কালীপদ সিদ্ধান্তের পিতামহ সর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীরাম রায়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। ইঁহারা উভয়ে শাক্ত এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিতেন। শ্রীরাম রায় এক সময়ে মুদির ব্যবসায় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি একবার একটী পাঠশালা করিয়াছিলেন। ইংরাজি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কেতুগ্রামে জনৈক কুটুম্ব-গৃহে তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই।

অযোধ্যারাম রায়ের চারি পুত্র,—কৃষ্ণধন রায়, সারদাপ্রসাদ রায়, রাখালদাস রায় এবং সতীশচন্দ্র রায়।

---

* এই চারিজনের প্রত্যেকেই কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুত্র নহেন। ঠিক সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই।

† অযোধ্যারাম রায় ও শ্রীরাম রায় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

কৃষ্ণধন রায় ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের দোষ ছিল। সামান্য কারণেই তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। তিনি দুইবার উন্মাদ্‌রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। লোকে বলিত যে, রাখালদাস রায় ও সতীশচন্দ্র রায়ের বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় হওয়ায়, তিনি উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন। প্রথমবার অনেক চিকিৎসায় তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে পাগল হইবার হেতু কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। চিকিৎসার নিমিত্ত সতীশচন্দ্র রায় তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কৃষ্ণধন রায়ের একমাত্র পুত্র যোগীন্দ্রনাথ রায় দাঁইহাটে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার এক কন্যা ও এক পুত্র। কন্যাটীর সন ১৩২৮ সালে মৃত্যু হইয়াছে। পুত্রটীকে পিতামাতায় আদর করিয়া 'হাবল' বলিয়া ডাকে।

সারদাপ্রসাদ রায় সামান্য পার্শি জানিতেন। তিনি কিছুদিন কান্দি মহুকুমায় মোক্তারি করিয়াছিলেন। তখন কেহ সামান্য পার্শি জানিলে মোক্তারি করিতে পারিত;—পরীক্ষা দিতে হইত না। তিনি অবিবাহিত অবস্থায় অকালে কালকবলে নিপতিত হন।

রাখালদাস রায় বাল্যকালে লেখাপড়ায় অবহেলা করিতেন। তাঁহার বাল্যজীবন কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তিনি গোপনে কলিকাতা পলায়ন করেন। তথায় কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় হয়। তিনি রাখালদাস রায়কে ব্যবসায় করিতে উপদেশ দেন এবং ব্যবসায়ের নিমিত্ত তাঁহাকে কিঞ্চিদধিক একশত টাকা প্রদান করেন। তিনি ঐ মূলধন লইয়া টিনের বাক্স, লণ্ঠন, ল্যাম্প প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছিল। তিনি অনেক অর্থ আপন বিবাহে এবং

ভ্রাতা সতীশচন্দ্র রায়ের বিবাহে ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় কবিগান করাইতেন। এই সময় তাঁহার উন্নতির সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। এই উন্নতির সময় তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যোগীন্দ্রচন্দ্র রায়ের বিবাহ দিয়াছিলেন।

চিরদিন সমান ভাবে কাহারও অর্থাগম হয় না। এই সময় ষ্টীল ট্রাঙ্কের প্রচলন আরম্ভ হইল। লোকে আর টিনের বাক্স ব্যবহার করে না। কাজেই রাখালচন্দ্র রায়কে বাধ্য হইয়া ষ্টীলের ট্রাঙ্কের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইল। কিন্তু তাহাতে মূলধন অধিক প্রয়োজন। সুতরাং তাঁহার ব্যবসায়ে আর পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাগম হইত না। এই সময় যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাকে দুইটী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছিল। বিপদ কখন একাকী আগমন করে না। এই সময় রাখালচন্দ্র রায় একটী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতার ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইল। এরূপ ঘটনা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষের অহঙ্কার বৃথা, তাহার কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, সর্ব্বনিয়ন্তার হস্তে জীব ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র।

ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় ব্যবসায় বন্ধ করিয়া বাটীতে অবস্থিতি-কালে রাখাল-দাস রায় কখন কখন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার শেষ জীবন এরূপ শোচনীয় হইবে, তাঁহার উন্নতির সময় এ কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। উন্নতির সময় তিনি ভূমি ও পুষ্করিণী ক্রয় করিবার নিমিত্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেন। কলিকাতা হইতে সময় সময় বাটী আসিয়া, কেহ ভূমি বিক্রয় করিবে কিনা সন্ধান লইতেন। তখন কত লোক তাঁহার তোষামোদ করিত। আজ অর্থাগমশূন্য, ব্যাধিগ্রস্ত রাখালদাস রায় ভূমি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়া, কখন কখন ক্রেতা পাইতেন না। এ সময় কেহই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিত

না। কেবল দারাপুত্রহীন, সম্পত্তিভ্রষ্ট রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর সহিত এ সময় তাঁহার যথেষ্ট প্রণয় হইয়াছিল। তিনি এ সময় সর্ব্বদাই রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার সহিত অতীত সুখের এবং বর্ত্তমান দুঃখের গল্প করিতেন। হায় রে! মানুষের অবস্থা কি পরিবর্ত্তনশীল! স্বীয় উন্নতির সময় এই রাখালদাস রায়, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর কতই না নিন্দা করিতেন, কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে পড়িয়া আজ তিনি রাধিকাপ্রসাদের পরম বন্ধু হইয়াছেন!

ইংরাজি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথমে রাখালদাস রায় পরলোক গমন করেন।

রাখালদাস রায়ের কিরণ ও জগৎ নাম্নী দুই কন্যা এবং বসন্তকুমার নামক এক পুত্র। দাঁইহাট-নিবাসী শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের সহিত কিরণ দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। অম্বলগ্রামে জগৎ দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। বসন্তকুমার রায় অবিবাহিত অবস্থায় সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ইংরাজি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষে কিম্বা ১৯২০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে। জগৎ দেবীও নিঃসন্তান অবস্থায় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। কেবলমাত্র কিরণ দেবী সন্তানাদি লইয়া স্বামীসহ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। রাখালদাস রায়ের শোকাতুরা পত্নী এখনও বর্ত্তমান আছেন।

সতীশচন্দ্র রায় যৌবনের প্রারম্ভে দাঁইহাটে বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসনের দোকানে মহুরির কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি কলিকাতায় একটা বাসনের দোকানে অনেক দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষে দোকানের স্বত্বাধিকারী কোন অপরিহার্য্য হেতুবশতঃ দোকানটী বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তদনন্তর সতীশচন্দ্র রায় বহুদিন কলিকাতায় দালালি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি একটী কঠিন পীড়ায়

আক্রান্ত হইয়া বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাখালদাস রায়ের ন্যায়, তিনিও নিঃসম্বলাবস্থায় ভাগ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত কলিকাতা গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই দুষ্কর-কর্ম্মশীল (Adventurous) উদ্যোগী, পরিশ্রমী, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, অধ্যবসায়ী. আশাযুক্ত (hopeful) এবং বাণিজ্য বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন।

ইঁহারা দুই ভ্রাতায় একই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা টিনের কারখানায়, পাট-কলে, কয়লা-কুঠিতে এবং ধান্যের দোকানে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন। যদি তাঁহারা কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা কলিকাতার ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেন না। অত্যন্ত মনোকষ্টের সহিত তাঁহারা কলিকাতার ব্যবসায় বন্ধ করিয়াছিলেন। যে কোন ব্যক্তি এই দুই ভ্রাতার সদ্‌গুণসমূহের অনুসরণ করিবে, তাহাদের কখনও অন্নকষ্ট হইবে না।*

সতীশচন্দ্র রায়ের দুই পুত্র,—প্রমথনাথ রায় ও দিবাকর রায় এবং চারি কন্যা,—অন্তিকালী দেবী, প্রমীলা দেবী, ঈশানী দেবী ও ত্রিনয়নী দেবী।

প্রমথনাথ রায় যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই সাধারণের হিতকর কার্য্যে যত্নশীল। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, চৌধুরী আবুলকাসেম মিয়ার সহিত, ইংরাজি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আগড়ডাঙ্গায় "যুবক-সমিতি" নামক একটী সমিতি স্থাপন করেন।

অনাথ-আতুরের সেবা, মৃতদেহের সৎকার, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, শিক্ষা-বিস্তার, গ্রাম্য-দলাদলির নিরসন এবং হিন্দু-মুসলমানে একতা-সংস্থাপন—

* সতীশচন্দ্র রায় সন ১৩২৯ সালের ১০ই আশ্বিন, সোমবার, শুক্লপক্ষ, ত্রয়োদশী তিথিতে রাত্রি ৩ টার সময় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এ সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। আশা করি, যুবকবৃন্দ প্রমথনাথের সাধারণ হিতকর কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

দিবাকর এক্ষণে (১৯২১ খৃষ্টাব্দে) সালার জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে।

বাবুরাম রায়ের বংশ।

শ্যামসুন্দর রায়ের বংশ-বিবরণ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে বাবুরাম রায়ের বংশ বর্ণিত হইবে।

বাবুরাম রায়ের পুত্র রামলোচন রায়। রামলোচন রায়ের পুত্র ক্ষেত্রনাথ রায়।

ক্ষেত্রনাথ রায় বিবাহ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার পরলোকগমনের পর বাবুরাম রায়ের বংশ লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছে।

গোবিন্দ রায়ের বংশ।

রায় বংশের দুইটী শাখা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় শাখার বিবরণ লিখিত হইবে।

গোবিন্দ রায় আগড়ডাঙ্গার গোকুলচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা রুক্মিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। রুক্মিণী দেবীর গর্ভে ঠাকুরদাস রায় ও রামকুমার রায় নামক দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দ রায় অকালে কালকবলে নিপতিত হন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী রুক্মিণী দেবী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

ঠাকুরদাস রায়ের দুই পুত্র, কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ও কৈলাসচন্দ্র রায়।

রামকুমার রায়ের কামাখ্যাচরণ রায় নামক এক পুত্র ও মাতঙ্গিনী

দেবী নামক এক কন্যা। কামাখ্যাচরণ রায় ও মাতঙ্গিনী দেবী উভয়েই নিঃসন্তান।

ঠাকুরদাস রায়ের দ্বিতীয় পুত্র কৈলাসচন্দ্র রায় স্বর্ণময়ী দেবী নাম্নী একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কৈলাসচন্দ্র রায়ের খুড়ুমণি দেবী নামক একমাত্র কন্যা। তিনি কন্যাটীকে শান্তিপুরে ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক একটী পাত্রের সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। খুড়ুমণি নিঃসন্তান ছিলেন।

ঠাকুরদাস রায়ের প্রথম পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র রায় জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি সচ্চরিত্র ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। আগড়ডাঙ্গার আনন্দচন্দ্র চৌধুরী তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি চেষ্টা করিয়া এবং স্বয়ং জামিন থাকিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের চাকরি সংগ্রহ করিয়া দিতেন। তিনি চৌধুরী মহাশয়কে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের সহিত মধুসূদন রায়ের পিতা ঘনরাম রায়ের অত্যন্ত মনোমালিন্য ছিল। কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ঘনরাম রায়ের বাটীর উপর দিয়া তাঁহাদের দুর্গামণ্ডপে ভোগ লইয়া যাইতেন। ঘনরাম রায় এরূপভাবে ভোগ লইয়া যাইতে বাধা দেওয়ায়, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটী মোকদ্দমা হয়। বিচারপতি বিচার করিয়া আজ্ঞা দিলেন যে, কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ঘনরাম রায়ের বাটীর উপর দিয়া ভোগাদি লইয়া যাইতে পারিবেন না। এই মোকদ্দমার পর হইতে উভয়ের শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।*

মুক্তকেশী দেব্যা নাম্নী ঘনরাম রায়ের এক রক্ষিতা ছিল। কীর্ত্তিচন্দ্র

---

* লেখক এই মোকদ্দমার রায়ের নকল ঘনরাম রায়ের দৌহিত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট দেখিয়াছিলেন।

রায় তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং কিছুদিন তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র—প্রতাপচন্দ্র রায় শ্যামাচরণ রায় এবং গণেশচন্দ্র রায় ও পাঁচ কন্যা—স্বর্ণ দেবী, শারদা দেবী, মোক্ষদা দেবী, জগৎতারিণী দেবী ও সাধেশ্বরী দেবী।

প্রতাপচন্দ্র রায় কচুটিয়া গ্রামে সরকারদের বাটীতে আতরমণী দেবী নাম্নী একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার সন্তানাদি নাই।

শ্যামাচরণ রায় কাগ্রামে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান। তিনি কয়েক বৎসর কার্ত্তিক পূজা এবং জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়াছেন। তাঁহার বাটীর পশ্চিমদিকস্থ জামিরশল্লা নামক পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তিনি একটী অশ্বত্থবৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি সস্ত্রীক গয়া, কাশী, জগন্নাথ প্রভৃতি অনেক তীর্থ দর্শন করিয়াছেন। তিনি অতি সমারোহের সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি উল্লিখিত পুণ্য কর্ম্ম-সমূহে পরম যত্নের সহিত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণকেও অতি যত্নের সহিত ভোজন করাইয়াছেন। তাঁহাদের পৈত্রিক দুর্গোৎসবের সময় দুর্গাষষ্ঠী ও সন্ধিপূজায় তাঁহার পালা। তিনি ষষ্ঠী-পূজার দিন ব্রাহ্মণাদি সকল জাতীয় ব্যক্তিগণকেই পরম যত্নে ভোজন করাইয়া থাকেন। সন্ধি-পূজার বলিদানের পর ব্রাহ্মণগণকে দেবীর প্রসাদ ফলমূল এবং বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের লুচি ভোজন করাইয়া থাকেন। অনেককে দেবীর উক্ত প্রসাদ দান করেন।

শ্যামাচরণ রায় জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্য বেশ ভাল বুঝেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর। তবে বেড়গ্রাম-নিবাসী মুন্সি সাজেদার রহমান মিয়া নামক জনৈক পত্তনিদারের কার্য্য করিয়া, অনেকের ন্যায় তাঁহাকেও যথেষ্ট অনুতাপ করিতে হইয়াছে। উক্ত কর্ম্মের নিমিত্তই রামশঙ্কর রায়ের

অতি প্রিয়তম বস্তু বড় পুষ্করিণীর চারি আনা অংশ আজ মুন্সি সাজেদার রহমান মিয়ার হস্তগত হইয়াছে। রামশঙ্কর রায় যখন বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বড় পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, যখন নানা দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া উক্ত পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যখন উক্ত পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা-দিবসে অসংখ্য ব্রাহ্মণ-শূদ্র-দরিদ্র প্রভৃতি ভোজন করাইয়াছিলেন, উক্ত পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা-দিবসে যখন অসংখ্য কাঙ্গালি বিদায় করিয়াছিলেন, তখন রামশঙ্কর রায় স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এই পুষ্করিণীর চারি আনা অংশ একদিন মুসলমানের হস্তগত হইবে। কিন্তু হায়! সর্ব্ব-বিধ্বংসী কালের গতি নদীর গতি অপেক্ষাও কুটিল! ধ্বংস এবং পরিবর্ত্তন সর্ব্বগ্রাসী কালের নিত্যকর্ম্ম!! উক্ত কর্ম্মের ফলে শ্যামাচরণ রায়ের আরও অনেক সম্পত্তি মুন্সি সাজেদার রহমান মিয়ার হস্তগত হইয়াছে।

রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী গল্প করিতেন যে, চৌধুরীদের শত্রুর মধ্যে শ্যামাচরণ রায়ের ন্যায় ভয়ানক এবং কপট শত্রু আর দ্বিতীয় কেহ নাই। চৌধুরীদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী, তারিণী প্রসাদ চৌধুরী এবং গ্রামস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকট যাহা শুনিয়াছি এবং আমি স্বয়ং যাহা অবগত আছি, তাহা যথাস্থানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। শ্যামাচরণ রায় চৌধুরীদের দৌহিত্র ঠাকুরদাস রায়ের পৌত্র, সুতরাং তিনি আমার পিতৃস্থানীয় এবং তিনি আমার পিতা তারিণী-প্রসাদ চৌধুরীর সম্বন্ধে দাদা হন। এরূপ পূজনীয় ব্যক্তির নিন্দা লিপিবদ্ধ করিতে আমি অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতেছি। তবে আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। চৌধুরী-বংশের তৎকালীন ইতিহাস বর্ণনার নিমিত্ত, ইতিহাসের অনুরোধে, আমাকে এরূপ অপ্রিয় সত্য লিখিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। "জাল প্রতাপচাঁদ" লিখিয়া স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তদানীন্তন বর্দ্ধমান-রাজের বিরাগ-ভাজন হন নাই। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী-

লেখক শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায়, দেবী সিংহ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং কান্ত বাবুর ইতিহাস লিখিয়া নশিপুরের রাজা, কান্দির রাজা কিম্বা কাশিমবাজারের মহারাজার বিরাগ-ভাজন হন নাই। আশা করি আমিও শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের বিরাগ-ভাজন হইব না।

ভবিষ্যতে শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের বাটীর চতুঃসীমা ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিগণের চিত্তাকর্ষক হইবার সম্ভাবনা। অতএব তাহা এ স্থলে লিখিত হইল। তাঁহার বাটীর পূর্ব্বে গ্রাম্যপথ, পশ্চিমে তাঁহার জামিরশল্লা নামক পুষ্করিণী, উত্তরে কমলাকান্ত এবং রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটী এবং দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্যপথ।

রামশঙ্কর রায়ের বংশ।

এই বংশ আগড়ডাঙ্গার রায় বংশের একটী শাখা। রামশঙ্কর রায়ের পিতার নাম নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। রামশঙ্কর রায়ের পিতার অবস্থা তত ভাল ছিল না। যৌবনকালে রামশঙ্কর রায় ভাগ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত বর্দ্ধমান গমন-মানসে গ্রামস্থ সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বীরেশ্বর আগমবাগীশকে একটী ভাল দিন গণনা করিতে বলিলেন। আগমবাগীশ মহাশয় গণনা করিয়া একটী দিনের মাহেন্দ্র-ক্ষণ নির্ণয় করিলেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ঐ দিনের মাহেন্দ্র-ক্ষণে রামশঙ্কর রায়কে বর্দ্ধমান যাত্রা করাইলেন। সেই সময় স্ত্রীলোকেরা রামশঙ্কর রায়ের নিমিত্ত অন্ন রন্ধন শেষ করিয়া, তাঁহাকে আহার করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন, কিন্তু মাহেন্দ্র-ক্ষণ অতীত হইবার ভয়ে আগমবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে আহার করিতে নিষেধ করিলেন। রামশঙ্কর রায় আহার না করিয়াই বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। বাটীস্থ স্ত্রীলোকেরা মনে মনে আগমবাগীশ

মহাশয়কে গালি দিতে লাগিল। ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলে, আহার-নিদ্রা মানুষের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিতে পারে না।

রামশঙ্কর রায় বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া, রাজসংসারে কর্ম্মপ্রার্থী হইলে, মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর (তেজচাঁদ বাহাদুর) তাঁহাকে একটী কর্ম্ম প্রদান করিলেন। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমের সহিত কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় গ্রহগণ তাঁহার প্রতি এতদূর অনুকূল ছিল যে, তিনি যে কার্য্যে হস্ত নিক্ষেপ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার প্রশংসা হইত। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তিনশত ষাটখানি গ্রামের ইজারা প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে দরিদ্র রামশঙ্কর রায় এক্ষণে জমিদাররূপে পরিণত হইলেন। দরিদ্র ধনশালী হইলে, কোন কোন ব্যক্তি কৃপণ হয় এবং অনেকে দানশীল হয়। যাহারা কৃপণ হয়, তাহারা মনে করে,—"অর্থাভাবে আমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, এক্ষণে সর্ব্বদাই অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিব।" আর যাহারা দানশীল হয়, তাহারা মনে করে,—"অর্থাভাবে আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে, অতএব সর্ব্বদাই দারিদ্র্য-দুঃখপীড়িত ব্যক্তির অভাব বিমোচন করিতে সচেষ্ট থাকিব।" রামশঙ্কর রায় শেষোক্ত প্রকারের ব্যক্তি ছিলেন।

রামশঙ্কর রায়ের স্বধর্ম্মপরায়ণতা ও সদাশয়তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ইজারা গ্রহণ করিয়া, কয়েক বৎসরের মধ্যেই দুইটি শিব-স্থাপনা * ও একটী লক্ষ্মীজনার্দ্দন নামক শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনটী প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট ইষ্টক-নির্ম্মিত একটী সুন্দর দুর্গা-মন্দির নির্ম্মাণ

* রায়েদের ঠাকুর-বাটীস্থ পশ্চিমদ্বারী অত্যুচ্চ শিবমন্দির অযোধ্যারাম রায়ের মাতায় স্থাপিত।

করিলেন। উক্ত দুর্গা-মন্দিরের মধ্য-প্রকোষ্ঠে দুর্গা-প্রতিমা স্থাপন করা হয় এবং পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ-দ্বয়ে তিনি দুইটী মর্ম্মর-প্রস্তর-ক্ষোদিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাধারণের পানীয় জলের নিমিত্ত বড়-পুষ্করিণী নামক একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিলেন। বৎসরের মধ্যে তিনি অনেকবার ব্রাহ্মণ-ভোজন ও কাঙ্গালি বিদায় করিতেন। তিনি ইষ্টক-নির্ম্মিত একটী সুন্দর দুইতালা বাসভবন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কালের কঠোর নির্য্যাতনে ঐ বাসভবন এক্ষণে ধূলিকণায় পরিণত হইয়াছে। তবে উহার কিয়দংশ কালের কঠোর পীড়ন উপেক্ষা করিয়া, গর্ব্বিতভাবে এখনও দণ্ডায়মান আছে। ঐ অংশটী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একটী উত্তরদ্বারী গৃহের অংশরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বঙ্গদেশীয় জমিদারগণের সহিত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। এই বন্দোবস্তানুসারে জমিদারেরা নিয়মিত রাজস্ব দিয়া পুরুষানুক্রমে জমিদারী ভোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহার অধীনস্থ ইজারাদারগণের সহিত জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অর্থাৎ ইজারাদারগণকে চিরস্থায়ী পত্তনিস্বত্ব প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। অন্যান্য ইজারাদারগণ পরমানন্দে চিরস্থায়ী পত্তনি-স্বত্ব গ্রহণ করিয়া, ধনবান পত্তনিদাররূপে পরিণত হইলেন। এই সময় রামশঙ্কর রায়ের গ্রহবৈগুণ্য উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বর্দ্ধমানাধিপতিকে বলিলেন,—"প্রথমে আমার ইজারা-সংক্রান্ত হিসাব গ্রহণ করুন, তাহার পর আমি পত্তনি গ্রহণ করিব।" রাজা বলিলেন,—"আপনি পত্তনি গ্রহণ করুন, পরে ইজারা-সম্বন্ধীয় হিসাব গ্রহণ করা হইবে।" রামশঙ্কর রায় বর্দ্ধমানাধিপতির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

সুতরাং তিনশত যাট গ্রামের পত্তনি-গ্রহণ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। বর্দ্ধমান-রাজ ঐ সমস্ত গ্রামের পত্তনি-স্বত্ব অপরকে প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর রামশঙ্কর রায় একজন ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ ঐ সময়েই রামশঙ্কর রায়ের গৌরব-রবি চির-অস্তমিত হইয়াছিল।

রামশঙ্কর রায়ের পুত্র রামলোচন রায়। রামলোচন রায়ের পুত্র খোসাল রায়। খোসাল রায়ের পুত্র রণরাম রায়। রণরাম রায়ের পুত্র ঘনরাম রায়। ঘনরাম রায়ের পুত্র মধুসূদন রায় এবং কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা দেবী।

ঘনরাম রায়ের সন্তান দুইটীর মধ্যে সর্ব্বমঙ্গলা দেবী জ্যেষ্ঠা এবং মধুসূদন রায় কনিষ্ঠ। ঘনরাম রায় গ্রামের নিকটস্থ মালগ্রামে গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক পরম সুন্দর যুবকের সহিত স্বীয় কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা-বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। কোন কারণবশতঃ পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট হইলে, গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আগড়ডাঙ্গায় শ্বশুরালয়ে বাস করেন।

মধুসূদন রায় বিবাহ করেন নাই। রামশঙ্কর রায়-নির্ম্মিত অট্টালিকা জীর্ণ-সংস্কারাভাবে ভগ্ন হইলে, তৎ-সংলগ্ন কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া, মধুসূদন রায় দুইশত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুইশত মুদ্রা মূলধন লইয়া কুসীদ-ব্যবসায় করিয়া, তিনি মৃত্যুকালে দ্বাদশ সহস্র মুদ্রার অধিক রাখিয়া গিয়াছিলেন। অধমর্ণগণ তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করিত। তিনি কাহারও নিন্দা গ্রাহ্য করিতেন না।

মৃত্যুকালে মধুসূদন রায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তদীয় ভাগিনেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে উইল করিয়া প্রদান করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাসমারোহে মাতুলের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আগড়ডাঙ্গার পাঠশালা হইতে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কচুটিয়া গ্রামস্থ পাঠশালা হইতে উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষায় এবং পাঁচুন্দি গ্রামস্থ মধ্যবাঙ্গলা বিত্থালয় হইতে মধ্যবাঙ্গলা পরীক্ষায় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি হুগলী নর্ম্যাল বিত্থালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাতুল মধুসূদন রায়ের সমস্ত সম্পত্তি ও মুদ্রার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি যথেষ্ট মিতব্যয়ী ছিলেন; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ তাঁহার মাতুলের সঞ্চিত সমস্ত মুদ্রা নষ্ট হয় এবং তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার এরূপ ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত, তিনি এবং সাধারণে তাঁহার শ্বশুরের উপর দোষারোপ করিতেন। ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার মস্তিষ্কের দোষ ঘটিয়াছিল এবং তিনি অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছিলেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুত্র,—কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুই কন্যা,—উমা দেবী ও রুক্মিণী দেবী। বাঁকুড়া জেলায় পলাশডাঙ্গা গ্রামে উমা দেবীর বিবাহ হইয়াছে।

আগড়ডাঙ্গার ফুল-রায়দের বংশ।

ফুল-রায়-বংশ আগড়ডাঙ্গার রায়বংশের একটী অন্যতম শাখা। ফুল-রায়-বংশীয় তারাশঙ্কর রায়ের পুত্র কাশীনাথ রায়। কাশীনাথ রায়ের পুত্র বৈত্থনাথ রায়। বৈত্থনাথ রায়ের পুত্র রাধানাথ রায়। রাধানাথ রায়ের পুত্র জানকীনাথ রায়। জানকীনাথ রায়ের চারি পুত্র,—হারাধন রায়, রেণুপদ রায়, অবিনাশচন্দ্র রায় ও সরসীমোহন রায়।

হারাধন রায় অবিবাহিতাবস্থায়, উন্মাদ-রোগে, অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। রেণুপদ রায়ের নিভাননী দেবী ও সরোজিনী দেবী নাম্নী দুই কন্যা এবং তুলসীনারায়ণ রায় নামক এক পুত্র।

অবিনাশচন্দ্র রায়ের বিনয়কুমার রায় নামক এক পুত্র ও একটী কন্যা।

ফুল-রায়-বংশীয়গণ স্মরণাতীত-কাল হইতে প্রতি বৎসর কালীপূজা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে আগড়ডাঙ্গার মধ্যে ফুলরায়-বংশীয়গণের সঞ্চিত অর্থ সকলের অপেক্ষা অধিক ছিল। ইঁহাদের একটী প্রাচীন গৃহ ভগ্ন করিবার সময়, কয়েকজন মুসলমান-শ্রমিক মুসলমান রাজত্ব-কালের মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। *

পূর্ব্বকালে ফুল-রায়-বংশীয়গণের প্রায় সকলেই পণ্ডিত ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

এই বংশের অন্য একটী শাখা হইতে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ এক্ষণে বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত বামুণ্ডি (বামুনডিহি) গ্রামে বাস করিতেছেন।

ঈশান রায়ের বংশ।

এই বংশটী ফুল-রায়-বংশের একটী নিম্নতম শাখা মাত্র। ঈশানচন্দ্র রায় আনুমানিক সন ১২৩৮ সালে "ফুল-রায়েদের পুকুর" নামক পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন।

---

* এই ঘটনা আনুমানিক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল।

ঈশানচন্দ্র রায়ের পুত্র কালিদাস রায় পণ্ডিত ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি উন্মাদ-রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায়, মৃত্যু সম্বন্ধে পুলিস-তদন্ত হইয়াছিল। কালিদাস রায়ের দুই পুত্র এবং এক কন্যা। পুত্রদের নাম শশীভূষণ রায় ও হৃষিকেশ রায়। তাঁহারা উভয়েই পরলোক গমন করিয়াছেন। হৃষিকেশ রায় তদীয় কর্ম্মস্থল রংপুর জেলায় লোকান্তর প্রাপ্ত হন। আনুমানিক ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিবাহ করেন নাই।

শশীভূষণ রায়ের পুত্র জন্মে নাই। তাঁহার দুই কন্যা,—লিলু দেবী ও লোহিত দেবী। লিলু দেবীর বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত আবাদ গ্রামে বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার সন্তানাদি আছে।

লোহিত দেবীর বহরাণ গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার সন্তানাদি জন্মে নাই। তিনি এক্ষণে বিধবাবস্থায় আগড়ডাঙ্গায় পিতৃগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন।

শশীভূষণ রায়ের ভাগিনেয় দামোদর ভট্টাচার্য্য ও সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য খাটুন্দি গ্রামে * বাস করিতেছেন। তাঁহাদের টোল আছে। তাঁহারা অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী।

শশীভূষণ রায়ের বাটীর পূর্ব্বে ৺ জানকীনাথ রায়ের বাটী, পশ্চিমে "গোলক-কুঁড়ি" নামক পুষ্করিণী, উত্তরে ক্ষুদ্র পথ এবং দক্ষিণে "ফুল-রায়েদের গড়ে" নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী।

* খাটুন্দি বর্দ্ধমান জেলার, কাটোয়া মহকুমার, কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত।

আগড়ডাঙ্গার গোস্বামী-বংশ।

প্রমথনাথ গোস্বামী আগড়ডাঙ্গার গোস্বামী-বংশের আদিপুরুষ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ গঙ্গাবংশীয় গোস্বামী। তাঁহারা বর্দ্ধমান জেলার কাটয়া নগরের নিকটবর্ত্তী জগদানন্দপুর গ্রামে বাস করিতেন।

আগড়ডাঙ্গা গ্রামের কানাই মণ্ডল নামক জনৈক শুঁড়ি বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, প্রমথনাথ গোস্বামীকে চতুর্দ্দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি, একটি বাটী, দুইটী পুষ্করিণীর দুই আনা অংশ ও একটী বাগান দান করিয়া, তাঁহাকে আগড়ডাঙ্গা গ্রামে বসতি-স্থাপন করাইয়াছিল।

প্রমথনাথ গোস্বামী সন ১৩২৪ সালের আষাঢ় মাস হইতে ৺ শ্রীধর নামক একটি শালগ্রাম সহ আগড়ডাঙ্গা গ্রামে কানাই মণ্ডলের প্রদত্ত বাটিতে বাস করিতেছেন। ঐ বৎসরের ১৭ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যার সময়, গঙ্গাবংশীয় গোস্বামীদের কুলদেবতা ৺রাধামাধব সর্ব্বপ্রথমে আগড়ডাঙ্গা গ্রামে প্রমথনাথ গোস্বামীর, কানাই মণ্ডল-প্রদত্ত বাটীতে আনীত হইয়া, ২০শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে প্রতি বৎসর ১৭ই অগ্রহায়ণ ৺রাধামাধব আগড়ডাঙ্গার গোস্বামী-বাটীতে আনীত হইয়া, ২০শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। ঐ কয়েক দিন তথায় মহোৎসব হইয়া থাকে। ৺রাধামাধব, সদগোপ, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, মোদক প্রভৃতি সজ্জাতি-কর্ত্তৃক বাহিত হন।

প্রমথনাথ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা করিয়া থাকেন। তাঁহার নানা স্থানে শিষ্য আছে। তাঁহার দুই পুত্র,—পঞ্চানন গোস্বামী ও অবনীকুমার গোস্বামী।

আগড়ডাঙ্গার সেন-বংশ।

সেনেরা জাতিতে গন্ধবণিক। আগড়ডাঙ্গা গ্রামে তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। তাঁহাদের বহুসংখ্যক ভূমি ও একটী দোকান ছিল। তাঁহাদের দোকানে গ্রামের ভদ্রলোকেরা অপরাহ্নকালে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন।

মাধব সেনের পিতার নাম নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। মাধব সেনের চারি পুত্র,—১। কৃষ্ণলাল সেন, ২। রসিকলাল সেন, ৩। হীরালাল সেন ও ৪। নারায়ণ সেন। সন ১৩২৮ সালের অনেক পূর্ব্বে তাঁহারা পরলোক গমন করিয়াছেন।

১। কৃষ্ণলাল সেনের দুই পুত্র, রসরাজ সেন ও গোবিন্দ সেন। রসরাজ সেন বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত ধুরুপবাটী গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহার দুই পুত্র। গোবিন্দ সেন মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার নিকটবর্ত্তী রঘুনাথগঞ্জে বাস করিতেছেন। তিনি বিবাহ করেন নাই।

২। রসিকলাল সেনের পুত্র মহেন্দ্র সেন মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর থানার অন্তর্গত ঘোল্লাগ্রামে বাস করিতেছেন।

৩। হীরালাল সেনের পুত্র হরিপদ সেন, শ্যামাপদ সেন, দ্বিজপদ সেন, মনোরঞ্জন সেন মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার নিকটবর্ত্তী রঘুনাথগঞ্জে বাস করিতেছেন।

৪। নারায়ণ সেন নিঃসন্তান। তিনি এক্ষণে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হরিপদ সেনের পুত্র ভোলানাথ সেন। শ্যামাপদ সেনের তিন কন্যা। দ্বিজপদ সেনের এক কন্যা। মনোরঞ্জন সেনের এক কন্যা এবং এক পুত্র।

সেনেদের আগড়ডাঙ্গা গ্রামের বাটীর এক্ষণে অস্তিত্ব নাই। উক্ত বাটীর চতুঃসীমা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বে যমগড়ে নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, পশ্চিমে হিরুমণি পুষ্করিণী। উত্তরে হরিদাস ঘোষের (সৎগোপ) বাটী, এবং দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী।

উক্ত বাটীর উত্তরাংশে বামনদাস মুখোপাধ্যায় গোয়ালঘর প্রস্তুত করিয়াছেন। পশ্চিমাংশ ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণাংশে যোগীন্দ্রনাথ রায় কখন কখন খড় রাখিয়া থাকেন। চিরপরিবর্ত্তনশীল বসুন্ধরার এরূপ পরিবর্ত্তন অহরহঃ নয়নপথে পতিত হইলেও অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া, মনুষ্য গর্ব্বে স্ফীত হইয়া থাকে! ইহারই নাম মহামায়ার মায়া !!

আগড়ডাঙ্গার চঁদ-বংশ।

চঁদেরা জাতিতে গন্ধবণিক। ইঁহারা নামের শেষে “চন্দ্র” এই উপাধি লিখিয়া থাকেন। ইহা আগড়ডাঙ্গা গ্রামের একটী অতি প্রাচীন বংশ। ইঁহাদের বাটীতে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে।

চঁদ বংশীয়গণের মধ্যে গোলক চঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার একটী দোকান ছিল। তাঁহার সন্তান-সন্ততি ছিল না। তিনি একটী শিবস্থাপনা করিয়াছিলেন। উক্ত শিবপূজার নিমিত্ত নীলকণ্ঠ রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে শিবমন্দির সংলগ্ন একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, কয়েক বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তে গোলক-কুঁড়ি নামক একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন।

এখনও তাঁহার অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাঁহার বাটীর উত্তরে সরকারদের ও দুর্গাদাস চঁদের বাটী।* দক্ষিণে পথ ও বড়গড়ে

* দুর্গাদাস চঁদও জাতিতে গন্ধ-বণিক। তবে গোলক চঁদের জ্ঞাতি নহেন।

নামক পুষ্করিণী। পূর্ব্বে চৌধুরীদের ভূমি, যাহাতে গৌরচন্দ্র স্বর্ণকার সার ফেলিয়া থাকে এবং পশ্চিমে আশুতোষ চঁদের বাটী।

গোলক চঁদের অট্টালিকা ভগ্ন হইলে, রাধাবল্লভ স্বর্ণকার তথায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উক্ত বাটীতে এক্ষণে রাধাবল্লভ স্বর্ণকারের পুত্রগণ বাস করিতেছে। কে জানে ভবিষ্যতে আরও কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে !!

রাজচন্দ্র চঁদের (চন্দ্রের) বংশ এই বংশের অন্যতম শাখা হইতে উৎপন্ন। রাজচন্দ্র চঁদ ব্যবসায় উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার নিকটবর্ত্তী রঘুনাথগঞ্জে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি এবং তৎপুত্র হরিপদ চঁদ সপরিবারে তথায় অবস্থিতি করেন এবং দুর্গোৎসবের সময় আগড়ডাঙ্গা আগমন করেন। দুর্গোৎসব সমাপনান্তে তাঁহারা রঘুনাথগঞ্জ প্রতিগমন করেন। হরিপদ চঁদের পুত্রের আগড়ডাঙ্গায় বাস করিবার ইচ্ছা নাই। হরিপদ চঁদের পুত্র-কন্যাগণ রঘুনাথ গঞ্জে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, বাল্যাবধি তথায় বাস করিতেছে।

রাজচন্দ্র চঁদের বাটীর চতুঃসীমা ঃ—উত্তরে ৺রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর বাটী, দক্ষিণে বনয়ারি সিংয়ের বাটি, পূর্ব্বে আশুতোষ চঁদের খামার ও রাস্তা এবং পশ্চিমে গ্রাম্যপথ।

বিহারীলাল চঁদের বংশ, এই বংশের একটী শাখা হইতে উৎপন্ন। বিহারীলাল চঁদের দুই পুত্র,—আশুতোষ চঁদ ও হরিদাস চঁদ। বিহারী-লাল চঁদ এবং তৎপুত্র হরিদাস চঁদ পরলোক গমন করিয়াছেন।

আশুতোষ চঁদের পুত্র ফণীভূষণ চঁদ ও পুটু চঁদ। এক্ষণে আশুতোষ চঁদ ও রাজচন্দ্র চঁদ একত্রে তাঁহাদের পৈত্রিক দুর্গোৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অনুমিত হইতেছে যে, ভবিষ্যতে কেবল আশুতোষ চঁদের বংশধরগণ আগড়ডাঙ্গায় বাস করিবেন এবং রাজচন্দ্র চঁদের বংশধরগণ রঘুনাথগঞ্জে বাস করিবেন।

বীরেশ্বর আগমবাগীশের বংশ।

বীরেশ্বর আগমবাগীশ জাতিতে গ্রহবিপ্র। তিনি তন্ত্র ও জ্যোতিষের পণ্ডিত ছিলেন। তৎকালে বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ অল্পই দৃষ্ট হইত।

বীরেশ্বর আগমবাগীশের পুত্র গণেশ সিদ্ধান্ত,জ্যোতিষে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

গণেশ সিদ্ধান্তের পুত্র—সর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত ও পূর্ণানন্দ সিদ্ধান্ত। পূর্ণানন্দ সিদ্ধান্ত অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করেন।

সর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্তের পুত্র—হরিশ সিদ্ধান্ত। হরিশ সিদ্ধান্ত ইংরাজি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক প্রাপ্ত হন।

হরিশ সিদ্ধান্তের পুত্র কালীপদ সিদ্ধান্ত অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়াছেন। তিনি তাঁহাদের কৌলিক দুর্গোৎসব ও ভৈরবনাথের পূজা পূর্ব্বের ন্যায় পরিচালিত করিতেছেন। ইনি পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় কোন কোন বৎসর কালীপূজাও করিয়া থাকেন।

হরিশ সিদ্ধান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা যোগী দেবী বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত কির্ণার গ্রামের নগেন্দ্রনাথ আচার্য্যের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হইয়াছেন।

উমাদেবী হরিশ সিদ্ধান্তের কনিষ্ঠা কন্যা।

রামকানাই আচার্য্যের বংশ।

রামকানাই আচার্য্য জাতিতে গ্রহবিপ্র। তাঁহার পিতা শালগ্রাম আচার্য্য ও পূর্ব্বপুরুষগণ বীরভূম জেলার নান্নুর (নাঁহুর) থানার অন্তর্গত

কুন্দরা (কুঁদর) গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামটি কলগ্রামের সমীপ-বর্ত্তী।

রামকানাই আচার্য্য সর্ব্ব প্রথমে আগড়ডাঙ্গায় বাস করেন। তাঁহার পুত্র হারাধন আচার্য্য ইংরাজি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পরলোক গমন করেন।

হারাধন আচার্য্যের ছয় পুত্র,—১। শিবরাম আচার্য্য, ২। আশুতোষ আচার্য্য, ৩। হৃষিকেশ আচার্য্য, ৪। ভূপতি আচার্য্য, ৫। কুমারীশ আচার্য্য, ৬। পশুপতি আচার্য্য।

শিবরাম আচার্য্য জ্যোতিষে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। পশুপতি আচার্য্য পুলিসে কর্ম্ম করিতেছেন। অন্য ভ্রাতৃগণ জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী।

শিবরাম আচার্য্যের তিনটি ভগিনী। একটি ভগিনীর বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমার নিকটবর্ত্তী জলজলে ও অন্য একটীর পাথরঘাটায় বিবাহ হইয়াছে। অন্য একটি ভগিনী নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আগড়ডাঙ্গার দত্ত-বংশ।

দত্তবংশীয়গণ জাতিতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। চৌধুরীবংশের ন্যায় এইটীও আগড়ডাঙ্গার একটী অতি প্রাচীন বংশ। ইঁহাদের অনেক নিষ্কর ভূমি ছিল।

দত্তবংশীয়গণের মধ্যে কেবল রামচন্দ্র দত্তের নাম জানিতে পারা গিয়াছে। অপর কাহারও নাম নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। রাম-গোপাল রায় নামক কোন ব্যক্তি সন ১২৪০ সালে হস্ত-লিখিত একখণ্ড কাশীরাম দাসের মহাভারত রামচন্দ্র দত্তকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভারতটী এক্ষণে আগড়ডাঙ্গার বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে

সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। দত্তবংশ লোপ-প্রাপ্ত হইবার অনতিপূর্ব্বে কেবলমাত্র একটী অতি বৃদ্ধা বিধবা দত্ত-বংশে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি মহাভারতটী কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধাটীকে গ্রামের লোকে দত্ত ঠাকুরুণ বলিয়া ডাকিত। আনুমানিক সন ১২৯৬ সালে তাঁহার জীবন-দীপ চির-নির্ব্বাপিত হইয়াছে এবং তাঁহার সহিত দত্ত-বংশ সংসার হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।*

এক্ষণে দত্তবংশীয়গণের ভদ্রাসনের অস্তিত্ব নাই। শিবদাস তন্তুবায় ও কালিদাস মণ্ডল তথায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহাদের বাটীর উত্তরাংশ দত্তবংশীয়গণের ভদ্রাসনের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ চঁাদ।

কৃষ্ণ চঁাদ জাতিতে গন্ধবণিক। তিনি গোলক চঁাদ বা দুর্গাদাস চঁাদের জ্ঞাতি নহেন। ছবিলাল চঁাদ তাঁহার ভাগিনেয়। কয়েক বৎসর গত হইল, কৃষ্ণ চঁাদ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সমীপবর্ত্তী রঘুনাথগঞ্জে তাঁহার দৌহিত্রগণ বাস করিতেছেন।

এক্ষণে কৃষ্ণ চঁাদের বাটীর অস্তিত্ব নাই।

কৃষ্ণ চঁাদের বাটীর চতুঃসীমা—উত্তরে মঙ্গল-চণ্ডীর পুষ্করিণী, দক্ষিণে জয় স্বর্ণকারের বাটী, পূর্ব্বে ভূমি এবং পশ্চিমে গ্রাম্য পথ।

---

* ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে পরেশনাথ সরকার নামক দত্ত বংশের জনৈক দৌহিত্র বাস করিতেন। তাঁহার বংশ কেহ আছেন কি না অবগত নহি।

তৃতীয় খণ্ড।

কালীপদ চৌধুরীর মাতুল-বংশ।

তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পুত্র কালীপদ চৌধুরীর মাতুলালয় বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত ঠিবা নামক গ্রামে অবস্থিত। কালীপদ চৌধুরীর মাতামহ রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্ব্ব প্রথমে ঠিবাগ্রামে বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত ফেউগাঁ নামক গ্রামে বাস করিতেন।*

তাঁহারা আমাটের গাঙ্গুলি, রামের সন্তান এবং সাবর্ণ-গোত্রীয়। এই বংশে বহুসংখ্যক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ঠিবার বাটীতে এখনও অসংখ্য তিরেট ও তালপত্রে লিখিত ব্যাকরণ, কাব্য, এবং দশকর্ম্ম প্রভৃতির পুস্তক দৃষ্ট হয়। ইঁহারা শক্তি-উপাসক। ইঁহাদের ঠিবার বাটীতে রটন্তী-কালিকা পূজা হইয়া থাকে এবং ঠিবার বাটীতে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন নামক শালগ্রামের নিত্যসেবা হইয়া থাকে।

রূপরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র দেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। দেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র রামসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়। রামসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই পুত্র,—১। রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ২। রামযাদু গঙ্গোপাধ্যায়।

১। রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত ঠিবা নামক গ্রামে তাঁহার সহধর্ম্মিণী কল্যাণী দেবীর মাতুলালয়ে বাস করিয়াছিলেন। কল্যাণী দেবীর মাতুল-বংশীয়গণের উপাধি ভট্টাচার্য্য।

---

* রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামযাদু গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশধরগণ লাভপুর থানার অন্তর্গত (বীরভূম জেলা) যাদার গ্রামে বাস করিতেছেন।

তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ভট্টাচার্য্যদের বংশ লোপ-প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের দৌহিত্রী কল্যাণী দেবী তাঁহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। সুতরাং রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সস্ত্রীক ঠিবাগ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই পুত্র,—রাধিকাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রামরাম গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার চারি কন্যা,—১। এলোকেশী দেবী, ২। শ্রীরূপ দেবী, ৩। শৈলজা দেবী, ৪। নির্ম্মলকুমারী দেবী।

রাধিকাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই পুত্র,—১। সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় ও ২। রামময় গঙ্গোপাধ্যায়। সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত আইয়াপুর (এয়োপুর) গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহার চারি পুত্র,—১। বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২। শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৩। আদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ৪। চতুর্থ পুত্রের এখনও নামকরণ হয় নাই।

রাধিকাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র রামময় গঙ্গোপাধ্যায় বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর থানার অধীন ফিংতোর গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন। তাঁহার অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নামক একটী পুত্র।

রামরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই পুত্র,—রামব্রহ্ম গঙ্গোপাধ্যায় ও রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহারা ঠিবাগ্রামে পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেছেন।

রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা এলোকেশী দেবীর বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত আগড়ডাঙ্গা গ্রামে ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর পুত্র তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর সহিত পরিণয় হইয়াছিল। এলোকেশী দেবীর দুই পুত্র,—১। কালীপদ চৌধুরী ও ২। অচ্যুতানন্দ চৌধুরী এবং তিন কন্যা,—১। চিত্রাঙ্গনা দেবী, ২। হেমবরণী দেবী ও ৩। ছকড়ি দেবী।

অচ্যুতানন্দ চৌধুরী অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন।

কালীপদ চৌধুরীর তিন পুত্র,—১। সুরথচন্দ্র চৌধুরী, ২। সনৎকুমার চৌধুরী এবং ৩। প্রণবানন্দ চৌধুরী ও এক কন্যা,—দময়ন্তী দেবী।

চিত্রাঙ্গনা দেবীর বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত ঠিবাগ্রামের শশধর চট্টরাজের সহিত পরিণয় হইয়াছে।

হেমবরণী দেবীর বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর থানার অধীন কুরুম্বা গ্রামের রমানাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিবাহ হইয়াছে। হেমবরণী এক্ষণে বিধবা, তাহার এককড়ি নাম্নী একটী মাত্র কন্যা।

ছকড়ি দেবীর মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত মালিহাটি গ্রাম-নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সে এক্ষণে সধবাবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছে। তাহার হরিগোপাল ঠাকুর নামক একটীমাত্র পুত্র বর্ত্তমান আছে।

রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীরূপ দেবীর বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত গাঁদপুর-নিবাসী প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীরূপ দেবী সধবাবস্থায় বহুকাল হইল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নলিনাক্ষ চক্রবর্ত্তী নামক একটি পুত্র ও সুবাসিনী দেবী নাম্নী একটি কন্যা।

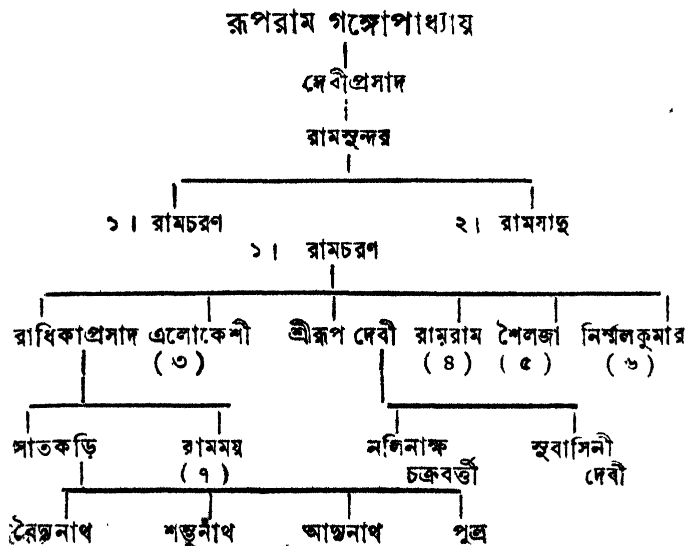
রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা শৈলজা দেবীর মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার সমীপবর্ত্তী ছাতনে-কান্দিগ্রামে দুর্গাদাস রায়ের সহিত পরিণয় হইয়াছিল। শৈলজা দেবী এক্ষণে বিধবা। তাঁহার দুই পুত্র,—১। উমাচরণ ও ২। কালীপদ রায় এবং দুই কন্যা।

রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চতুর্থা কন্যা নির্ম্মলকুমারী দেবীর বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত আগড়ডাঙ্গা গ্রামের তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর কনিষ্ঠ সহোদর রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

তাঁহার অম্বিকাচরণ চৌধুরী ও শঙ্কর চৌধুরী নামক দুইটী পুত্র ছিল। এক্ষণে নির্ম্মলকুমারী, রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী, অম্বিকাচরণ চৌধুরী ও শঙ্কর চৌধুরী—সকলেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। নির্ম্মলকুমারী দেবীর বংশ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে।

রামচরণ গাঙ্গুলির কনিষ্ঠ সহোদর রামযাদু গঙ্গোপাধ্যায় বীরভুম জেলার অন্তঃপাতী লাভপুর থানার অধীন মাঁদার গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহার তিন পুত্র —১। ঘনরাম গঙ্গোপাধ্যায়, ২। বিজয়রাম গঙ্গোপাধ্যায় এবং ৩। হরেরাম গঙ্গোপাধ্যায়।

কালীপদ চৌধুরীর মাতুল-বংশের একদেশ বংশাবলী।



৭। রামময়
- অনিলকুমার

৪। রামরাম
- রামব্রহ্ম
- রামকানাই

৩। এলোকেশী দেবী
- কালীপদ চৌধুরী
  - স্থরথ
  - সনৎকুমার
  - প্রণবানন্দ
  - দময়ন্তী
- অচ্যুতানন্দ চৌধুরী
  - ০
- চিত্রাঙ্গনা দেবী
  - সাতকন্যা
- হেমবরণী দেবী
  - এককড়ি দেবী
- ছকড়ি দেবী
  - হরিগোপাল ঠাকুর

৫। শৈলজা দেবী
- উমাচরণ রায়
- কালীপদ রায়
- দুইকন্যা

৬। নির্ম্মলকুমারী দেবী
- অম্বিকাচরণ চেধুরী
- শঙ্কর চৌধুরী

২। রামযাদু গঙ্গোপাধ্যায়
- হরেরাম
- ঘনরাম
- বিজয়রাম

কালীপদ চৌধুরীর পুত্র সুরথচন্দ্র চৌধুরীর মাতুল বংশ।

বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত কুরুম্বা নামক গ্রামে সুরথচন্দ্র চৌধুরীর মাতুলালয়। তাঁহার মাতুলবংশীয়গণের উপাধি ভট্টাচার্য্য, কাশ্যপগোত্র এবং সর্ব্বানন্দী মেল। তাঁহাদের পূর্ব্বোপাধি চট্টোপাধ্যায়। কুরুম্বাগ্রামে এবং বর্দ্ধমান জেলার কাটয়ানগরে গঙ্গাতীরে তাঁহাদের টোল ছিল। যজন, যাজন, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার নিমিত্ত তাঁহারা ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাটীতে শ্যামসুন্দর নামক রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির এবং শ্রীধর নামক শালগ্রামের নিত্য-সেবা হইয়া থাকে। তাঁহারা ঘটস্থাপনা পূর্ব্বক দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের বলিদান নিষিদ্ধ। তাঁহাদের ইষ্টক-নির্ম্মিত অতি প্রাচীন পূজা-মণ্ডপের জীর্ণসংস্কার এক্ষণে একান্ত প্রয়োজনীয়।

কংসারিনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য। মথুরানাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের পুত্র চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য। চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যের তিন পুত্র,—১। মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, ২। গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ৩। হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং ৪। কাত্যায়নী দেবী নাম্নী এক কন্যা।

১। মধুসূদনের পুত্র পূর্ণকাম ভট্টাচার্য্য। পূর্ণকাম নিঃসন্তান।

২। গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাশীনাথ, হরনাথ, গোকুলচন্দ্র, রাধিকা-প্রসাদ, দ্বারিকানাথ এবং দেবেন্দ্র নামক ছয় পুত্র এবং কুসুম, নীলাব্জ ও ভীষ্ম নাম্নী তিন কন্যা। গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নন্দলাল নামক এক

পুত্র, চপলা ও খুকী নাম্নী দুই কন্যা। দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য্যের করুণা-সিন্ধু ও নারু নামক দুই পুত্র। কুসুম দেবীর বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত বলাইপুরে সূর্য্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। কুসুম দেবীর কালী নাম্নী এক কন্যা এবং পদ মুখোপাধ্যায় নামক এক পুত্র। নীলাব্জ দেবীর বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণপুরে যোগীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। নীলাব্জ দেবীর নিত্য ও খুকী নাম্নী দুই কন্যা ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক পুত্র। ভীষ্ম দেবীর বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত নোরপুর গ্রামে কাশীনাথ রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ভীষ্ম দেবীর ভৈরবনাথ রায় ও খোকা নামক তিন পুত্র এবং চারি কন্যা।

৩। হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পত্নীর নাম শ্রীরূপদেবী। শ্রীরূপদেবীর গর্ভে হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রাখালদাস, রামনাথ, শ্যামাদাস ও প্রফুল্ল-কুমার নামক চারি পুত্র এবং হেমবরণী, বসন্ত ও জ্ঞানদা নাম্নী তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রাখালদাস ভট্টাচার্য্যের সরোজিনা দেবী নাম্নী প্রথমা পত্নীর গর্ভে কৃপাসিন্ধু ভট্টাচার্য্য নামক এক পুত্র এবং শৈবলিনী দেবী নাম্নী দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে কৃপাময় নামক এক পুত্র ও রাজলক্ষ্মী ও বিজয়া নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হেমবরণী দেবীর গোয়ালপাড়া গ্রামে (বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত) হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। হেমবরণী দেবীর নিভাননী দেবী নাম্নী একমাত্র কন্যা ছিল। নিভাননী দেবীর বর্দ্ধমান জেলার সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত নারাণপুর গ্রামে শশধর নামক একটী যুবকের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। নিভাননী অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছে।

বসন্ত দেবী সপ্তমবর্ষ বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে।

জ্ঞানদা দেবীর বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত আগড়-

ডাঙ্গাগ্রামে কালীপদ চৌধুরীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। জ্ঞানদা দেবীর সুরথচন্দ্র চৌধুরী, সনৎকুমার চৌধুরী ও প্রণবানন্দ চৌধুরী নামক তিন পুত্র এবং দময়ন্তী দেবী নাম্নী এক কন্যা।

৪। কাত্যায়নী দেবীর ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক তিন পুত্র, স্বর্ণময়ী দেবী, রাম দেবী ও রাজবালা দেবী নাম্না তিন কন্যা। ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বীরভুম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত কুরুম্বা গ্রামে (মাতামহের গ্রামে), তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জেলার কালনা নগরে বাস করিতেন। সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ধরণীধর মুখোপাধ্যায় ও শশধর মুখোপাধ্যায় নামক দুই পুত্র, বিমলা, কমলা, রাজরাণী, রমণ নাম্নী চারি কন্যা।

ধরণীধর মুখোপাধ্যায়ের সত্যকিঙ্কর নামক এক পুত্র এবং পাঁচকড়ি ও সাতকড়ি নাম্নী দুই কন্যা। শশধর মুখোপাধ্যায়ের শৈলজা নাম্নী এক কন্যা।

ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বিমলাদেবীর বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা নগরে নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। বিমলা দেবীর অন্নপূর্ণা দেবী নাম্নী এক মাত্র কন্যা। অন্নপূর্ণা দেবীর এক পুত্র ও এক কন্যা।

তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যোগমায়া নাম্নী একমাত্র কন্যা।

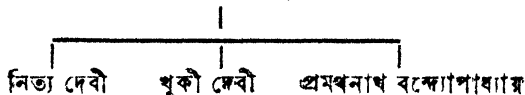
রাজবালা দেবীর বুধরো গ্রামে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার গতি দেবী, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অজ্ঞাতনাম্নী একটী কন্যা—এই তিন সন্তান। গতি দেবীর নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত মেটিরী গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম কালীপদ।

কালীপদ চৌধুরীর পুত্র সুরথচন্দ্র চৌধুরীর মাতুল-বংশের বংশাবলী।

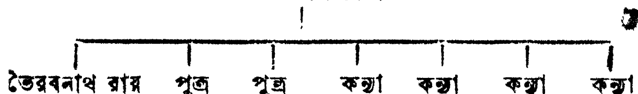
কংসারিনাথ ভট্টাচার্য্য।
|
মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য
|
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
|
গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য
|
চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য

- ১। মধুসূদন ভট্টাচার্য্য
  - পূর্ণকাম ভট্টাচার্য্য
- ২। গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
  - ৫ কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য
  - ৬ হরনাথ ভট্টাচার্য্য
  - ৭ গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
    - নন্দলাল ভট্টাচার্য্য
    - চপলা দেবী
    - খুকী দেবী
  - ৮ রাধিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
  - ৯ দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য্য
    - করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য্য
    - পুত্র
  - ১০ দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য
  - ১১ কুসুম দেবী
    - কালী দেবী
    - পদ্ম মুখোপাধ্যায়
  - ১২ নীলাব্জ দেবী
  - ১৩ ভীম দেবী
- ৩। হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
- ৪। কাত্যায়নী দেবী

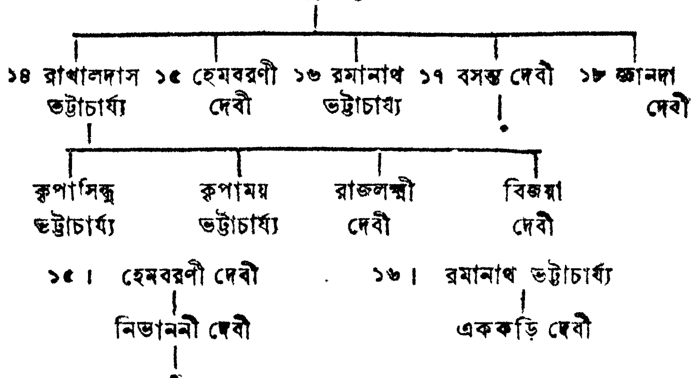
১২। নীলাব্জ দেবী



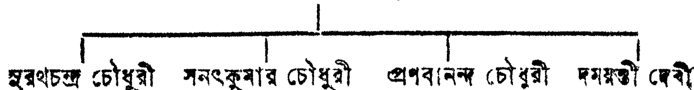
১৩। ভীষ্ম দেবী



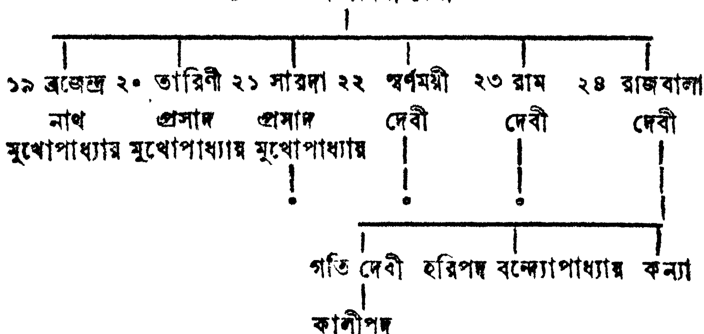
৩। হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য



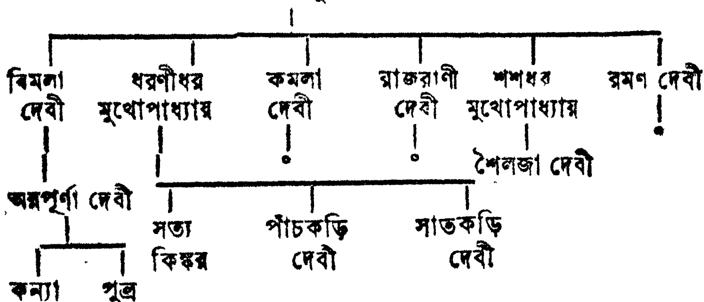
১৮। জ্ঞানদা দেবী



৪। কাত্যায়নী দেবী



১৯। ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



২০। তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যোগমায়া দেবী

আনন্দচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র পরেশনাথ চৌধুরীর দৌহিত্র-বংশ।

পরেশনাথ চৌধুরী কাটয়ার নিকটবর্ত্তী দাঁইহাট গ্রামের বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের * সহিত তাঁহার একমাত্র কন্যা গোলাপসুন্দরী দেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলে মেলের কুলীন। গোলাপ-সুন্দরী দেবীর তিন পুত্র—দ্বিজপদ বন্দোপাধ্যায়, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিনটী পুত্র রাখিয়া গোলাপসুন্দরী দেবী অকালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। রেণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়গণকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। পরেশনাথ চৌধুরীর জামাতা বিষ্ণুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় সন ১৩২৫ সালের ৬ই চৈত্র, বুধবার, শুক্লপক্ষ, অষ্টমী তিথিতে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পরেশনাথ চৌধুরীর দৌহিত্র দ্বিজপদ ও হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহাদের দাঁইহাটের বাটীতে গোবিন্দজী প্রভৃতি বিগ্রহের নিত্য সেবা হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ।

* বিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোষ্যপুত্র।

গ্রন্থকারের অন্য পুস্তক।

শিলং পাহাড়ে চৌদ্দদিন

ও

স্বপ্নরূপে কামাখ্যা-দর্শন।

(যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়,
২৬ নং কালীতলা বাগান লেন, কলিকাতা।